অবয়বহীন দুর্নীতি

ম. মাহমুদ

আইএফডি এক্সক্লুসিভ পেপার সিরিজ
পেপার ১

আগস্ট ১৩ , ২০০৯

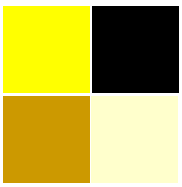

সূচিপত্র

ভূমিকা..... .... ২
সার সংক্ষেপ ৭

প্রথম পর্ব

১.১. অবয়বহীন দুর্নীতি.....২২

১.২. প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা.....৩৩

১.৩. রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার.....৪৬

দ্বিতীয় পর্ব

২.১. দুর্নীতির মাত্রা.....৬১

২.২. সূচকের বাইরের দুর্নীতি.....৯৭

২.৩. একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা.....১১৬

শেষ কথা..... ....১৩২

সংযুক্তি ১ঃ কালো টাকা – সাদা টাকা এবং কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ১৩৪

লেখকের নিজের কথা ১৬৩
আইএফডি পরিচিতি ১৬৪

ভূমিকা

দুর্নীতি বাংলাদেশে একটি সর্বগ্রাসী ব্যাধি, এই কথাটি নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন বিভাগ নেই যা এই ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত। রাজনৈতিক অঙ্গনেও দুর্নীতি এখন এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে দেশের শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম এখন আর ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে না।

কিন্তু এই ধরণের পরিস্থিতি বেশি দিন চলতে দেয়া উচিত নয়। আমরা যদি দেশকে আরো স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চাই, দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে যদি আগামীতে নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে নিতে চাই, তাহলে আমাদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তার প্রতিটির সাথেই দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাই দুর্নীতির মতো একটি সর্বগ্রাসী ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার পথ আমাদের সবাইকেই খুঁজতে হবে। এর জন্য যেমন প্রয়োজন দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করে একটি উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ, তেমনি দরকার ব্যাপক জনসচেতনতা।

এই দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই পলিসি পেপারটি তৈরী করা হয়েছে। লেখকের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে এই পেপারটি রচিত। গবেষণাটি বেশ কিছুদিন আগে বৃটেনের Emerald থেকে প্রকাশিত Humanomics জার্নালে ছাপা হয়েছে। গবেষণাটির শিরোনাম Corruption in Civil Administration: Causes and Cures (জনপ্রশাসনে দুর্নীতিঃ কারণ এবং প্রতিকার)।

এই গবেষণাটির মাধ্যমে একটি মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে সর্বস্তরে দুর্নীতি অনেকাংশেই কমে আসবে বলে আশা করা যায়। এই মডেলটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই তৈরী করা হয়নি, বরং যে কোন দেশের যে কোন প্রকার দুর্নীতি দমনেও এই মডেলটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই পেপারটি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশটির উদ্দেশ্য দুর্নীতির মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবহিত করা এবং দুর্নীতির মূল কারণগুলিকে চিহ্নিত করে এর একটি কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করা। এই অংশে তিনটি চ্যাপ্টার রয়েছে। প্রথমটির শিরোনাম *অবয়বহীন দুর্নীতি,* দ্বিতীয়টির শিরোনাম *প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা* এবং তৃতীয়টির শিরোনাম *রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার* । এই তিনটি চ্যাপ্টার পড়লে পাঠকরা যেমন দুর্নীতির মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন, তেমনি দুর্নীতি দমন করতে হলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত, তা সম্পর্কেও বিষদভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

পেপারটির দ্বিতীয় অংশেও তিনটি চ্যাপ্টার রয়েছে।

প্রথম চ্যাপ্টারটির শিরোনাম *দুর্নীতির মাত্রা,* দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটির শিরোনাম *সূচকের বাইরের দুর্নীতি* এবং তৃতীয়টির শিরোনাম *একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের রূপরেখা।* এই তিনটি চ্যাপ্টার পড়লে পাঠকরা দুর্নীতির ব্যাপ্তি কেমন হতে পারে তা যেমন জানতে পারবেন, তেমনি একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান বলতে কি বোঝায়, সেই সম্পর্কেও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। সেইসাথে পাঠকদের দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রচলিত কিছু ভুল ধারণারও বিবর্তন হবে। এখানে উল্লেখ্য, পেপারটির দ্বিতীয় অংশে যে সকল নতুন ধারণার অবতারণা করা হয়েছে, তা এর আগে কোথাও বিষদভাবে বলা হয়নি।

অন্যান্য দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা পেপারগুলোর সাথে এই পেপারটির তুলনা করলে পাঠকরা বেশ কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করবেন।

প্রথমত, এই পেপারটি লেখা হয়েছে সহজ বাংলা ভাষায়। পুরো বিষয়টি যেন সর্বমহলের পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে, সেই জন্য এই পেপারে কোন প্রকার ভাষাগত মাধুর্যের উপর জোর না দিয়ে সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কঠিন ইংরেজি ব্যবহার করে দুর্বোধ্য গবেষণা পেপার লেখার সনাতন স্টাইল এই পেপারে অনুপস্থিত।

আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে যে কোন সমস্যার সমাধানের অন্যতম প্রধান ধাপ হল সেই সমস্যাটি সম্পর্কে একটি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। অর্ধশিক্ষিত কৃষক থেকে শুরু করে বিদেশী ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত নাগরিকরা

যদি একটি সমস্যার মূল কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারেন, তাহলে সেই সমস্যাটির সমাধানে একটি সচেতনতার সৃষ্টি হবে। ফলে সরকারের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও সেই সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে সদিচ্ছা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা যদি তৈরী করা যায়, তাহলে সমস্যাটির সমাধান হবে দ্রুত এবং এর ফলে সমস্যাটিও আর ভবিষ্যতে সমস্যা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির প্রচলিত অনেক ধারণার বিপরীতে এই পেপারে বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং মাত্রা কেমন হতে পারে। প্রচলিত ধারণামতে, দুর্নীতি করার একটি অন্যতম মাধ্যম হল টাকার অবৈধ লেনদেন। কিন্তু এই পেপারটির দ্বিতীয় অংশটি পড়লে পাঠকরা বুঝতে পারবেন কোন প্রকার ঘুষের লেনদেন ছাড়াও বিরাটাকারের দুর্নীতি হতে পারে।

তৃতীয়ত, এই পেপারে সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বা Intellectual Corruption এর স্বরূপ যা নিয়ে কখনো কোন আলোচনা করা হয়না। অথচ এই দুর্নীতিটি এতোটাই ব্যাপক মাত্রার হতে পারে যে এর কারণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হতে পারে হাজার হাজার কোটি টাকা। এই ধরণের দুর্নীতির একটি বিশেষত্ব হল এই দুর্নীতি কোন প্রচলিত সূচকে ধরা পড়ে না। তাই সূচকের বাইরের এই দুর্নীতি সম্পর্কে জানার জন্য এই পেপারটি পাঠকদের অবশ্যপাঠ্য।

সর্বশেষে, এই পেপারটি শেষ করা হয়েছে একটি 'কার্যকরী' দুর্নীতি দমন অভিযানের রূপরেখা বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সকল দুর্নীতি দমন অভিযানই যে কার্যকর হতে পারে না, এর অন্যতম প্রমাণ সাম্প্রতিককালে তত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুর্নীতি দমন অভিযান। এই অভিযান প্রথম দিকে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে এই ধরণের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি দমন অভিযান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কার্যকর হতে পারে না।

এই পেপারটির দৈর্ঘ্য নিয়ে পাঠকদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। এই পেপারটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬। তাই এই দীর্ঘ পেপারটি পড়তে গিয়ে অনেকে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারেন। তবে বাস্তবতা হল, দুর্নীতি এবং তা নির্মূলের মতো একটি ব্যাপক এবং গভীর বিষয়কে মাত্র ১৬৬ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা আসলেই কষ্টকর। তবে সেই চেষ্টাই আমরা এখানে করেছি।

এই পেপারটিতে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে বলা দরকার, কোন প্রকার বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এই ধরণের মন্তব্য করা হয়নি। আমরা মনে করি বাংলাদেশ এখন এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন দুর্নীতির মত একটি সংবেদনশীল এবং অপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে সত্য স্বীকার করে নেয়ার সময় এসেছে।

আমরা বিশ্বাস করি দুর্নীতির মতো একটি সর্বগ্রাসী ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন এই সমস্যাটিকে স্বীকার করে নেয়া। অতীতে বাংলাদেশে দুর্নীতি বিস্তারের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও দেশের ভিতর থেকে এই বাস্তবতাকে বার বার অস্বীকার করা হচ্ছিল। এই কারণে অতীতে বাংলাদেশে কোন দুর্নীতি বিরোধী অভিযানও পরিচালিত হয়নি। তবে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নেওয়াতেই একটি ব্যাপক দুর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল।

আমরা যদি আমাদের অপ্রিয় বাস্তবতাকে স্বীকার না করে একটি নকল মুখোশ পরে নিজেদের দুর্বলতাকে বার বার আড়াল করতে থাকি, তাহলে এই সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না। তাই আমরা পাঠকদের অনুরোধ করব এই পেপারটি খোলা মন নিয়ে পড়ার জন্য।

সর্বশেষে বলতে চাই, এই পেপারটির মাধ্যমেই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক Ideas for Development বা IFD'র যাত্রা শুরু। আমরা এখনো জানি না, এই যাত্রাপথটি বন্ধুর হবে, নাকি মসৃণ হবে। তাই এই অজানা পথটিকে মসৃণ করার জন্য চাই আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা। এই সহযোগিতার প্রথম ধাপটিই হতে পারে এই পেপারটি মন দিয়ে পড়া।

এই পেপারটি যদি আপনার কাছে দীর্ঘ মনে হয়, তাহলে সময় নিয়ে পড়ুন। তারপরও পড়ে শেষ করুন। কারণ এই পেপারটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন দুর্নীতির সর্বব্যাপী থাবা একদিন আপনাকে কিংবা আপনার পরিবারকেও গ্রাস করতে পারে। তাই সেই রকম একটি পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে আমাদের সবাইকে দুর্নীতির বিপক্ষে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

আমার আশা করি নতুন স্টাইলে লেখা এই গবেষণাধর্মী পেপারটি আপনাদের ভালো লাগবে।

ম. মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা,আইএফডি

এই পেপারের অন্তর্নিহিত সকল মন্তব্য, গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য এবং যে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়।

সার সংক্ষেপ

(১)

বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞামতে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি বলে। দুর্নীতি বাংলাদেশে সর্বব্যাপী। এমন কোন খাত পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতির প্রকোপ নেই। দুর্নীতি পরিমাপ করা বেশ জটিল কাজ। অর্থনীতিতে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ কালো টাকা তৈরী হচ্ছে, তা যদি পরিমাপ করা যেত, তাহলে দুর্নীতি পরিমাপের একটি গ্রহণযোগ্য সূচক তৈরী করা যেত। কিন্তু কালো টাকা পরিমাপের কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য পন্থা নেই বলে দুর্নীতি পরিমাপ করা হয় পারসেপশন বা ধারণার উপর ভিত্তি করে।

দুর্নীতি এমন একটা রোগ যার কোন অবয়ব নেই। এর সাথে যেমন জড়িয়ে আছে ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মতো এমন বিষয় যাকে সংখ্যায়িত করা যায় না, তেমনি জড়িয়ে আছে নৈতিকতার মত বিষয় যা অবয়বহীন। দুর্নীতির এই অবয়বহীনতার কারণেই এখন পর্যন্ত এর কোন গাণিতিক সমাধান বের করা যায়নি। এই কারণে অতীতে দেখা গেছে দুর্নীতি দমনের একটি কৌশল এক দেশে কার্যকর হলেও অন্য আরেকটি দেশে তা ভাল ফল দেয়নি।

দুর্নীতি অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। একজন এতে আক্রান্ত হলে অপরজনও এতে আক্রান্ত হতে পারে। তাই এই ছোঁয়াচে রোগ যখন সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর প্রভাব হতে পারে সুদুরপ্রসারী। দুর্নীতি মানুষের নৈতিকতাবোধকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। নৈতিকতাবোধ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষকে টাকা দিয়ে কেনা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই সমাজের ক্ষমতাধররা যদি এইভাবে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যান, তাহলে দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের দুর্নীতির বিস্তারের জন্য কোন বিশেষ মহল বা দলকে দায়ী করা ঠিক নয়। এর জন্য দায়ী শুধু ক্ষমতাধররা নন, বরং যারা এই ক্ষমতাধরদেরকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, এবং যারা এই ধরণের অপতৎপরতা দেখেও কোন প্রতিবাদ করেননি, তারা সকলেই এই অবস্থার জন্য দায়ী।

বাংলাদেশে একটি সাধারণ ধারণা হল, যারা দুর্নীতি করছেন তারা অসৎ, এবং বাকি যারা রয়েছেন, তারা সকলেই সৎ। কিন্তু আমরা যদি বিষয়টির গভীরে যাই তাহলে দেখব,

যারা দুর্নীতি করছেন না, তাদের হয়তো দুর্নীতি করার কোন সুযোগই নেই, কারণ তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। অতএব, তাদের তো দুর্নীতি করার কোন প্রশ্নই আসেনা, কারণ ক্ষমতার অপব্যবহারই তো দুর্নীতির জন্ম দেয়।

তাই প্রকৃত সৎ ব্যক্তি তিনিই যার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তিনি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন না। এখন আমরা যদি এই ধরণের ব্যক্তি খুঁজতে থাকি, তাহলে দেখব সমাজে প্রকৃত সৎ ব্যক্তির সংখ্যা আসলেই খুব কম।

দুর্নীতি একটি অদৃশ্য হাতির মত। এর আকার সম্পর্কে যেমন ধারণা করা কঠিন, তেমনি এর ব্যাপ্তি নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে বিশেষজ্ঞরা যখন এই অদৃশ্য হাতির আকারের কথা বলেন তখন একটি অংশের কথা বলতে গিয়ে অপর অংশটি বাদ দিয়ে দেন। ফলে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মুল অনেক কঠিন হয়ে যায়। আবার অনেক সময় এই সমাধানগুলো এমন ভাষায় বলা হয় যা নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষেও বোঝা সহজ নয়। ফলে সমাজে দুর্নীতি নির্মুলের সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। সমাজের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যদি দুর্নীতি নির্মুলের সদিচ্ছা তৈরী করা না যায়, তাহলে হাজার সমাধান দিয়েও সমাজ থেকে কোনদিন দুর্নীতি নির্মুল হবে না।

অনেকেরই ধারণা রয়েছে একটি মাত্র স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করলেই বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মুল হয়ে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব অনেক বেশি হওয়ার কারণে একটি মাএ দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মুল করা যাবে না। বরং এই ধরণের একটি মাএ সংস্থা থাকলে ধীরে ধীরে এই সংস্থার উপর মানুষের আস্থা চলে যাবে। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ দুর্নীতি নির্মুল নয়, বরং মানুষকে দুর্নীতি না করার ব্যাপারে ভয় দেখানোই এই কমিশনের প্রধান কাজ।

আমরা চারিদিকে যদি বিভিন্ন সমস্যার দিকে একবার তাকাই এবং চিন্তা করি, তাহলে দেখব আমাদের চারপাশের প্রতিটি সমস্যার পিছনেই দুর্নীতির কোন না কোন হাত আছে। আমরা যখন পানি সমস্যা, কিংবা বিদ্যুৎ সমস্যায় জর্জরিত হই, তখন আমাদের মনে থাকে না, অন্য খাতে দুর্নীতিকে উৎসাহ দিতে গিয়েই আমাদের ক্ষমতাধররা এই প্রয়োজনীয় খাতগুলিতে কোন প্রকার উন্নয়ন করেননি। তাই এই সমস্যাগুলিরও কোন সমাধান হয়নি।

আমাদের চারপাশে যখন সড়ক দুর্ঘটনাগুলি ঘটে এবং আমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে হারাই, তখন হয়তো দেখা যায় যার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেই ড্রাইভারটির

হয়তো কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। এই অবৈধ লাইসেন্স সে আবার পেয়েছিল পুলিশকে টাকা দিয়ে। তাই এই দুর্ঘটনার জন্য প্রাণহানির মূল কারণ এই ছোট্ট দুর্নীতি।

আবার বিভিন্ন লঞ্চ দুর্ঘটনায় আমরা যখন আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে হারাই, তখন আমরা কখনো চিন্তা করে দেখি না, এই লঞ্চটির ত্রুটিপূর্ণ কাঠামোর কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো আবার টাকা দিয়ে পাশ করে আনা হয়েছে সরকারি বিভাগ থেকেই। তাই সরকারি বিভাগে যদি দুর্নীতি না থাকতো, তাহলে লঞ্চের কাঠামোর এই গলদ ধরা পড়ত। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও অনেক কমে যেত।

তাই আমরা যদি আমাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন ভোগান্তি থেকে রক্ষা করতে চাই, কাছের প্রিয়জনদেরকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাই, তাহলে দুর্নীতির বিপক্ষে না যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

(২)

বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, এ যেন এক স্বপ্নের বিষয়। কেউ কখনো কোন সরকারি বিভাগে সেবা নেয়ার জন্য গেছেন, অথচ তাকে কোন অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়নি, এই ধরণের অভিজ্ঞতা এখন নেই বললেই চলে। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের সরকারি বিভাগগুলির এই দুর্নাম ছিল না। তাই সরকারি বিভাগগুলিতে দুর্নীতির প্রকোপ কেন বেশী, তার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। কাউকে দুর্নীতিবাজ বলার আগে দেখা উচিৎ এই ধরণের আচরণের পিছনের কারণগুলি কি কি।

ড. রবার্ট ক্লিটগার্ড দুর্নীতির কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেছেন ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবধানই দুর্নীতি সৃষ্টি করে। তাই কারো যদি অধিক ক্ষমতা থাকে, এবং তার জন্য যদি জবাবদিহিতার কাঠামো না থাকে, তাহলে সে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। তাই একটি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি কমানো যায় ক্ষমতাকে কমিয়ে কিংবা জবাবদিহিতাকে বাড়িয়ে।

ক্ষমতা দুই প্রকার, ঐচ্ছিক ক্ষমতা এবং একচ্ছএ ক্ষমতা। কোন একটি সেবার জন্য আমাদেরকে যদি একটি প্রতিষ্ঠানের উপরেই নির্ভর করতে হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন মামলা করার জন্য আমরা পুলিশ বিভাগের উপর নির্ভর করি। তাই এই সেবা দেয়ার জন্য পুলিশ বিভাগ একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক।

আবার কোন একটি কাজ কাকে দেয়া হবে, কোন মূল্যে দেয়া হবে, তা অনেক সময় নির্ভর করে কোন এক বিশেষ সরকারি কর্মকর্তার উপর। তাই এই ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ কর্মকর্তা ঐচ্ছিক ক্ষমতারও মালিক।

জবাবদিহিতাকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, অন্তঃজবাবদিহিতা এবং বহিঃজবাবদিহিতা। অন্তঃজবাবদিহিতা কাজ করে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে, আর বহিঃজবাবদিহিতা কাজ করে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে। অন্তঃজবাবদিহিতার উদাহরণ হতে পারে দোষ করলে জরিমানা কিংবা পদ থেকে বরখাস্ত করা। বহিঃজবাবদিহিতার উদাহরণ হতে পারে কেউ দুর্নীতি করলে তা মিডিয়াতে প্রকাশ করা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বা ন্যায়পালের দৃষ্টিতে এনে তার আদালতে বিচার করা।

ড. রবার্ট ক্লিটগার্ডের উদ্ভাবিত পন্থাতে দুর্নীতি দমনের কৌশল নির্ধারণ করে অনেক দেশে দুর্নীতি কমানো গেলেও অন্যান্য অনেক দেশে এই কৌশলটি কাজ করেনি। এর অর্থ হল ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার বাইরেও এমন অনেক বিষয় আছে যা দুর্নীতি সৃষ্টি করে।

এই দুটি বিষয়ের বাইরে যে সকল বিষয় দুর্নীতি সৃষ্টি করে তার অন্যতম হল বেতন-ভাতা। কোন সরকারি অফিসারের যদি বেতন কম থাকে, তাহলে সে দুর্নীতিগ্রস্থ হতে পারে। আবার মানুষের বিভিন্ন মানসিক দিকও দুর্নীতির কারণ। যেমন মানুষের প্রয়োজন এবং লোভ তাকে দুর্নীতিতে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এই প্রয়োজন এবং লোভ আবার বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম।

তাই দুর্নীতির কোন সমাধান তৈরী করতে হলে প্রথমে বিষয়টিকে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ দুর্নীতি করে একজন ব্যক্তি, কোন প্রতিষ্ঠান নয়। অতএব, মানুষের মানসিক কারণগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করে এর সাথে সম্পর্ক দেখাতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলির। তাই দুর্নীতির মুল কারণ প্রয়োজন এবং লোভ। প্রয়োজনের দুর্নীতি এবং লোভের দুর্নীতির যোগফলই হল মোট দুর্নীতি।

মানুষের দুর্নীতির প্রয়োজন সৃষ্টি হয় যদি তাকে ন্যায্য বেতন ভাতা থেকে কম বেতন ভাতা দেয়া হয়। আবার তার ক্ষমতার সাথে যদি এই বেতন ভাতার একটি বিরাট ব্যবধান থাকে, তাহলে লোভের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই লোভের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবধানের কারণেও। তাই কোন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি কমাতে হলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সাথে বেতনভাতা এবং জবাবদিহিতা কাঠামোর সমন্বয় সাধন করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বেশি, সেই প্রতিষ্ঠানে বেতন ভাতাও বেশি থাকতে হবে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার

কাঠামোও অনেক শক্তিশালী থাকতে হবে। এটাই কয়েক বছর আগে উদ্ভাবিত এম এম মডেলের মুল কথা।

এম এম মডেল বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমেই সরকারি বিভাগগুলিকে ক্ষমতার ক্রমানুসারে একে একে সাজাতে হবে। এরপর এর সাথে সমন্বয় করতে হবে বেতন ভাতা এবং জবাবদিহিতা কাঠামোর। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার ক্রমানুযায়ী এই ধরণের বেতন ভাতা বাড়ানোর কার্যক্রম বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। তাই সরকারের উচিত প্রথমে ক্ষমতা কমিয়ে এরপর জবাবদিহিতা এবং বেতন ভাতার সমন্বয় করা। এর ফলে সরকারের মোট খরচ হবে কম। এই ক্ষেত্রে অন্তঃজবাবদিহিতার প্রভাব বহিঃ জবাবদিহিতার প্রভাবের চেয়ে বেশি। সেইসাথে সরকার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেবার মুল্য ধার্য করতে পারে। এই ধরণের কার্যক্রম শুরু করা গেলে সরকারি অফিসারদের মধ্যে উন্নত সেবা চালু করার চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটবে।

এম এম মডেলের শক্তিশালী দিক হল এর সিম্পলিসিটি। এই মডেলের মাধ্যমে দুর্নীতির সকল কারণকেই একটি মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আগে কখনো করা হয়নি। এছাড়া এই মডেলে দুর্নীতির অদৃশ্য হাতির আকার-আকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় এবং সেইসাথে এটাও বোঝা যায়, দুর্নীতি দমনের কাজটি আসলেই কোন যায়গা থেকে শুরু করতে হবে।

তবে এই মডেলের কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। যেমন এই মডেলে ধরে নেয়া হয়েছে, নীতিনির্ধারক বা রাজনীতিবিদদের মধ্যে সবসময় দুর্নীতি দমনের সদিচ্ছা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

যে কোন মডেল বাস্তবায়নের আগে সবার প্রথমে উচিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুর্নীতি দমনের সদিচ্ছা তৈরী করা। এই সদিচ্ছা তৈরী করা না গেলে কোন প্রকার মডেলেই কোন কাজ হবে না। বাংলাদেশের মত একটি আপাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুর্নীতি দমনের সদিচ্ছা কেন তৈরী হয় না, তা জানার জন্য আমাদেরকে নির্বাচনী ব্যবস্থার মুলে যেতে হবে।

(৩)

দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা সমাজে আস্থা হারাচ্ছেন, এটি কোন নতুন বিষয় নয়। রাজনীতিবিদদের এই ধরণের একটি ভাবমূর্তির কারণে নতুন প্রজন্ম রাজনীতিতে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অথচ রাজনীতি হল দেশসেবার সবচেয়ে

কার্যকরী ক্ষেত্র। একজন রাজনীতিবিদ চাইলে দেশকে যতো দ্রুত বদলে ফেলতে পারেন, আর কেউ তা পারে না।

তাই আমাদের সবাইকে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই বৈকল্যের কারণ খুঁজতে হবে। কোন রাজনীতিবিদকে দুর্নীতিবাজ বলার আগে ভেবে দেখতে হবে রাজনীতিবিদদের এই ধরণের আচরণের কারণ কি।

রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির কারণও একই। অর্থাৎ প্রয়োজন এবং লোভ। তবে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির প্রয়োজন একজন সরকারি চাকুরিজীবীর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ একজন রাজনীতিবিদ যখন নির্বাচিত হয়ে যান, তখন তার আশেপাশের মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশার জন্ম হয়। সেই প্রত্যাশা পুরণ করতে গিয়ে অনেক রাজনীতিবিদকে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়।

তবে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির প্রয়োজনের একটি বড় কারণ প্রচারণা। একজন রাজনীতিবিদকে এখন নির্বাচনে জয়ী হতে হলে প্রচারণা খাতে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। এর কারণ ভোটারের কিছু দুর্বলতা, যেমন ভোটার প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় এবং ভোটার চমক পছন্দ করে। তাই এই দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে একজন রাজনীতিবিদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরণের টাকার প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে কারণ বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যা ঘনত্ব সম্পন্ন দেশ হওয়াতে এর প্রতিটি আসনে ভোটার সংখ্যা অন্যান্য যে কোন দেশের চেয়ে অনেক বেশি। এই ভোটাররা দিন দিন শিক্ষিত হচ্ছে, স্মার্ট হচ্ছে। তাই আগে যে ভোটারকে একটি সমাবেশ বা মাইকিং করেই প্রভাবিত করা যেত, সেই একই ভোটারকে প্রভাবিত করার জন্য এখন প্রয়োজন হচ্ছে বাহারী বিলবোর্ড, কিংবা অত্যাধুনিক টিভি চ্যানেল। তাই দুর্নীতির প্রয়োজনও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে।

সাম্প্রতিককালে যে সকল টিভি চ্যানেল স্থাপিত হয়েছে তার প্রতিটিরই মালিক কোন না কোন রাজনীতিবিদ। কারণ তারা সকলেই জানেন আগামীতে ভোটযুদ্ধে জয়ী হতে হলে এই আকাশ সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে।

সমাজে ন্যায়বিচারের অভাবও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির প্রয়োজনের জন্য দায়ী। আমাদের সমাজে ক্ষমতাহীনের উপর ক্ষমতাধরদের অত্যাচার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ধারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসাতে সমাজে টিকে থাকার জন্য সকলেরই লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে ক্ষমতাধর হওয়া। আর সহজে ক্ষমতাধর হওয়ার একটি মাধ্যম হয়ে উঠছে

রাজনীতি। তাই এখন রাজনীতিতে তারাই আসছেন যারা সহজে ক্ষমতাধর হয়ে এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে চান। এই ধরণের ব্যক্তিরা যখন একবার রাজনীতিবিদ হয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা প্রাণপন চেষ্টা করছেন তার সেই অবস্থান ধরে রাখার জন্য। ফলে নির্বাচনের সময় প্রচারণা খাতে তাদেরকে অঢেল ব্যয় করতে হচ্ছে।

রাজনীতিবিদদের এই দুর্নীতির প্রয়োজনের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর এখন প্রথম পছন্দ সেই সকল প্রার্থীদেরকে যাদের টাকা পয়সার কোন কমতি নেই। এদের অনেকের আবার আইন প্রণেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে, আবার অনেকেরই নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন সেই সকল সৎ এবং যোগ্য প্রার্থীরা যাদের টাকা পয়সা নেই। এই সকল সৎ প্রার্থীরা যদি একবার নির্বাচিত হয়ে যান, তাহলে পরবর্তীবার বিজয়ী হওয়ার জন্য তাদেরকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এই কারণে এখন অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে আগে এই ধরণের কোন অভিযোগ ছিল না।

অতীতের বিভিন্ন গবেষণাতে রাজনৈতিক দুর্নীতি কমানোর জন্য যে সকল সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে দেখা যায় প্রস্তাবনাগুলোতে বিভিন্ন আইন করে দুর্নীতি কমানোর উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে। অথচ দুর্নীতির এই প্রয়োজন কমানোর কোন পথ বাতলে দেয়া হয়নি। তাই দুর্নীতির প্রয়োজন যতোদিন থাকবে, রাজনীতিবিদরা ততোদিন দুর্নীতিকে বিভিন্নভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যাবেন। ফলে আইন করে কোন ফল পাওয়া যাবে না।

তবে বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ তিন বছর আগে তাদের সংসদে পেশকৃত সংস্কার প্রস্তাবে একটি দাবী করেছিলেন যা রাজনৈতিক দুর্নীতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রস্তাবটি তারা পরবর্তীতে আর পেশ করেননি। এই প্রস্তাবনাতে বলা হয়েছিল নির্বাচনে প্রচারণার ভারটি যেন তৃতীয় কোন পক্ষকে দিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নের্তৃবৃন্দ দাবী করেছিলেন নির্বাচন কমিশন যেন প্রচারণার এই দায়িত্বটি নেয়।

এই দাবী যদি বাস্তবে রূপ লাভ করে তাহলে রাজনীতিবিদদের প্রয়োজনের দুর্নীতি অনেক কমে আসবে বলে আশা করা যায়। কারণ তখন একজন প্রার্থীর টাকা আছে, নাকি নেই, এই বিষয়টি আর গুরুত্বপূর্ণ থাকবে না। তখন গুরুত্ব পাবে প্রার্থীর কোয়ালিটি এবং জনপ্রিয়তা। তাই সকলেই আগ্রহী হবেন নিজের যোগ্যতা দিয়ে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর প্রতি। ফলে আমাদের ছাত্র রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে, দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে, এবং মিডিয়াতেও সৎ সাংবাদিকতার একটি তাগিদ সৃষ্টি হবে।

এম এম মডেল অনুযায়ী রাজনীতিবিদদের বেতন ভাতা হতে হবে সবচেয়ে বেশি। কারণ সমাজে তারাই সবচেয়ে ক্ষমতাধর। লোভের দুর্নীতি কমানোর জন্য তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর জবাবদিহিতার মধ্যেও রাখতে হবে। তবে যেহেতু রাজনীতিবিদরা একজন আরেকজনের পরিচিত, বন্ধু কিংবা আত্মীয়, সেহেতু জবাবদিহিতার এই ধরণের ব্যবস্থা বাস্তবে কতটুকু কার্যকর হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই রাজনীতিবিদদের লোভের দুর্নীতি কমানোর জন্য নৈতিকতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

(৪)

প্রচলিত ধারণামতে, কোন দুর্নীতি বেশী দুর্নীতি এবং কোন দুর্নীতি কম দুর্নীতি, তা পরিমাপের জন্য লেনদেনকৃত টাকার পরিমান মুখ্য। তবে এই ধরণের একটি ধারণা নিয়ে একটি ভাল বিতর্ক হতে পারে। কারণ এমন অনেক বড় বড় দুর্নীতি রয়েছে যাতে টাকার সরাসরি কোন লেনদেন হয় না। টাকার সরাসরি কোন লেনদেন হয় না বলে এই ধরণের অনেক উচ্চ মাত্রার দুর্নীতি কোন প্রকার সুচকে ধরা পড়ে না। এমন এক ধরণের দুর্নীতি হল বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বা Intellectual Corruption।

আবার আমাদের সমাজে এমন অনেক দুর্নীতিবাজ রয়েছেন যারা বিদেশীদের খুব অল্প টাকা কিংবা খ্যাতির বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে কাজ করতে পিছপা হন না। তাদের মুখে দেশের কথা থাকলেও তারা কাজ করেন বিদেশীদের প্ররোচনায় এবং বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

প্রচলিত সুচক অনুযায়ী এই সকল দুর্নীতি অনেক কম মাত্রার দুর্নীতি হলেও নৈতিকতার বিচারে এই ধরণের দেশবিরোধী কর্মকান্ড বা রাষ্ট্রদ্রোহীতা সবচেয়ে উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাংলাদেশে অতীতে সন্ত্রাসী বিরোধী অভিযান এবং দুর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালিত হলেও দেশবিরোধী নির্মূল অভিযান কখনো পরিচালিত হয়নি। এই দেশবিরোধীদেরকে প্রকাশ্যে চিহ্নিতও করা হয়নি।

তবে দুর্নীতির বিভিন্ন মাত্রা থাকলেও রাষ্ট্রদ্রোহীতা ব্যতীত অন্যান্য সকল মাত্রার দুর্নীতির শাস্তি একই রকম হওয়া উচিত। কারণ তা যদি না হয়, তাহলে মানুষ কম মাত্রার দুর্নীতি করতে উৎসাহিত হবে। ফলে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ উচ্চ মাত্রার দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাবে।

(৫)

দুর্নীতি নিয়ে সর্বত্র অনেক আলোচনা হলেও সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে যে একটি নিরব দুর্নীতি বিরাজমান, সেই বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির কথা কিন্তু কেউ বলেন না। এর একটি কারণ হল এই সকল দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষের পকেট থেকে টাকা চলে যায়, কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না বলে কোন প্রকার সূচকে এই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি ধরা পড়ে না।

এই সকল পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অডিটর, গবেষক, শেয়ার মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এবং সাংবাদিক উল্লেখযোগ্য। সমাজ বিভিন্ন সেবার জন্য এই সকল পেশাজীবীদের উপর নির্ভর করে। ফলে তারা অনেক ক্ষমতা উপভোগ করেন যার অপব্যবহার তারা চাইলেই করতে পারেন।

বাংলাদেশে শিক্ষকরা যখন ক্লাস নেয়া বাদ দিয়ে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যান, তখন তার মূল্য দিতে হয় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। ডাক্তাররা যখন একটি টেস্টের বদলে রোগীকে একাধিক টেস্ট করাতে বাধ্য করান, কিংবা মিথ্যা কথা বলে সার্জারী করান, তখন তা চ্যালেঞ্জ করা কোন রোগীর পক্ষেই সম্ভব হয় না।

একইভাবে গবেষকদের মেধাভিত্তিক ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে মূল্য দিতে হয় দেশকে। স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যে মেধাভিত্তিক দুর্নীতি হয়, তার ফলে সমাজের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লাভবান হয় বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা। আবার অডিটররা যখন ব্যবসায়ীদেরকে কর ফাঁকিতে সহায়তা করেন, তখন তা রাষ্ট্রেরই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতা পরিমাপের মাপকাঠিতে শিক্ষকদের ক্ষমতা সবচেয়ে কম। তাই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার হয় মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের উপরেই। গবেষকদের ক্ষমতাও কম, কিন্তু কোন এক বিশেষ গবেষকের উপর যদি নীতিনির্ধারকরা নির্ভরশীল হয়ে যান, তাহলে সেই গবেষকের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ক্ষমতার বিচারে ডাক্তারদের ক্ষমতা অনেক বেশী কারণ সমাজের সকলেই তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজের এই নির্ভরশীলতা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

ক্ষমতা পরিমাপের মাপকাঠিতে মিডিয়াকর্মীরা এখন সবচেয়ে ক্ষমতাধর পেশাজীবী। এর কারণ তথ্য জানার জন্য আমাদের সকলকেই যেমন মিডিয়ার উপর নির্ভর করতে হয়,

তেমনি সমাজের স্বীকৃতি লাভের জন্যও মিডিয়ার উপর আমাদের নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছে। তাই বাড়ছে মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতাও।

এই ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষমতা ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কারণ মানুষ সাধারণত একটি পেপারই পড়ে। ফলে একটি সংবাদ কতটুকু সঠিক, তা অনেকেই জানতে পারেন না। কিন্তু ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার বেলাতে দর্শকও অনেক ক্ষমতার মালিক, কারণ এখানে দর্শক চাইলেই একটি চ্যানেল বদলে আরেকটি চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন একটি সংবাদের ক্ষেত্রে চ্যানেলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম। তবে আজকাল ইন্টারনেটের প্রসারের কারণে অনেকেই একাধিক সংবাদপত্র পড়ছেন। ফলে প্রিন্ট মিডিয়াকর্মীদের ক্ষমতা আগের চেয়ে কমছে।

একটি মিডিয়ার সঠিক সংবাদ পরিবেশন মানে এই নয় যে সেই মিডিয়াটি কোন প্রকার দুর্নীতির সাথে জড়িত নয়। বরং একটি মিডিয়ার নিরপেক্ষ ইমেজ যতোই বাড়ছে, মিডিয়াটির দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও ততোটাই বাড়ছে। এর কারণ মিডিয়ার সাথে দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা হয় শুধুমাত্র প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং যে সংবাদ কখনোই প্রকাশিত হবে না, সেই সংবাদকে কেন্দ্র করেই একটি নিরপেক্ষ মিডিয়া হাউজ জড়িয়ে যেতে পারে বিরাটাকার দুর্নীতিতে।

মিডিয়ার দুর্নীতি কমানোর জন্য তাদের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন কাঠামো গড়া গেলেও মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বেশ কঠিন। আধুনিক ধারণা মতে, মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে পাঠক কিংবা দর্শক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক কিংবা দর্শকরা মিডিয়া যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। মিডিয়ার ভুল তাদের চোখে ধরা পড়ে না। ফলে মিডিয়ার জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয় না।

বাংলাদেশ দিন দিন গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্প নির্ভর দ্রুত প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ধারা যতোই বাড়তে থাকবে, মিডিয়ার উপর আমাদের নির্ভরতাও ততোই বাড়তে থাকবে। কারণ আমাদের ব্যস্ততা দিন দিন বাড়বে, ফলে কমবে সামাজিক মেলামেশার সময়। তাই একটি মিডিয়া যা বলছে তা অন্য জনের বক্তব্যের মাধ্যমে যাচাই করার সম্ভাবনাও দিন দিন কমবে। তাই মিডিয়ার উপর আমাদের নির্ভরতা এভাবে দিন দিন যতোই বাড়তে থাকবে, মিডিয়ার ক্ষমতাও ততোই বাড়তে থাকবে। ফলে বাড়বে দুর্নীতির সুযোগ।

মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেন সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাদেরকে সমাজ চেনে এবং যারা মিডিয়ার এই দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ। তাই তারা যদি মিডিয়ার ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে সোচ্চার হোন, শুধু তাহলেই মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত

হতে পারে। তবে সাধারণত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে মিডিয়ার দুর্বলতা নিয়ে কখনোই কোন কথা বলতে দেখা যায় না। এর কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। তাই তারা ভয় পান, তারা যদি মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চান, তাহলে মিডিয়াও তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

এছাড়া মিডিয়া সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসও মিডিয়ার জবাবদিহিতার অন্তরায়। অনেকে বিশ্বাস করেন, বর্তমান যুগে বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্টার কিংবা সেলেব্রিটি সৃষ্টি করে মিডিয়া। তাই এই সকল সেলেব্রিটিরা মনে করেন, যে মিডিয়া তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, সেই মিডিয়ার বিরুদ্ধে তারা বলতে যাবেন কেন?

এই ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাস বদলানো না গেলে ভবিষ্যতে মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে না। ফলে বাড়বে মিডিয়ার ক্ষমতা এবং সেইসাথে দুর্নীতির সুযোগ।

(৬)

অনেকে মনে করেন শুধুমাএ দুর্নীতিবাজদেরকে ধরে ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশের বেলায় এই ধারণাটি সত্য হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধারণা ঠিক নয়। এর কারণ বাংলাদেশে যারা ক্ষমতাধর, তাদের কম বেশী সবাই কোন না কোনভাবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। সমাজের সকল স্তরে নের্তৃত্বও দিচ্ছেন তারাই। এই ক্ষমতাধরদের মধ্যে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই একজনকে যদি ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে অপরজন আতঙ্কিত হয়ে যাবেন। ফলে সমাজে সকল ক্ষমতাধরই যদি আতঙ্কিত হয়ে যান, তাহলে সমাজে অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

এই ধারা লক্ষ্য করা গেছে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের সময়। তখন একইরকম একটি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালিয়ে সমাজের ক্ষমতাধরদেরকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতে। বিনিয়োগ স্থবির হয়ে যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়। ফলে সরকার এক সময় বাধ্য হয়ে দুর্নীতি দমন অভিযান থামিয়ে দেয়।

তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনার আগে সবার আগে মানুষকে সৎ থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। সেইসাথে ন্যায়বিচার কতটুকু প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করা উচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্তত আগামী দুই দশক পর এমন একটি বাংলাদেশ তৈরী করা যেখানে কোন দুর্নীতি থাকবে না। দুর্নীতি করার প্রয়োজনও থাকবে না। দুর্নীতি কমানোর পাশাপাশি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনও করতে হবে একই গতিতে। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত আগামী বিশ বছর পর এমন একটি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করা যাদের দুর্নীতি করার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

এই ধরণের একটি বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদেরকে সবার আগে ঠিক করতে হবে দুর্নীতি দমনের কৌশল। দুর্নীতি দমনের অনেক উপকরণ রয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরী, দুর্নীতি এবং প্রভাবমুক্ত মিডিয়া তৈরী, এবং সামগ্রিক নৈতিকতার উন্নয়নও দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের অনুসঙ্গ।

দুর্নীতি ধরার কৌশল মাএ দুটি। প্রথম, দুর্নীতি করার সময়ই কাউকে হাতে নাতে ধরা। দ্বিতীয়, মানুষের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে যদি কোন বৈষম্য থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে এই বৈষম্য তৈরী হচ্ছে নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে। তাই এই বৈষম্য যাদের থাকবে, তাদেরকে দুর্নীতির অভিযোগে আটক করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপরের দুটি কৌশলের বাস্তবায়নই কঠিন। কারণ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হওয়ার কারণে দুর্নীতিবাজদেরকে হাতে নাতে ধরতে হলে প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হবে। তাই তাদেরকে কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় না আনলে তারাই বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে। ফলে দুর্নীতি না কমে বরং আরো বেড়ে যেতে পারে।

তাই প্রথম কৌশলটির সাথে দ্বিতীয় কৌশলটিরও আশ্রয় নিতে হবে। সরকার তার নাগরিকদের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের বৈষম্য তালাশ করতে পারে একমাএ ট্যাক্স রিটার্নের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশে সময়মত ট্যাক্স দেয়ার সংস্কৃতি এখনো চালু হয়নি। ফলে দেশের অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকার প্রবাহ অনেক বেশী। তাই হঠাৎ করে যদি এই ধরণের বৈষম্য তালাশ করা শুরু হয়, তাহলে সমাজে আবারো আতঙ্ক ছড়াবে। ফলে এই কালো টাকা পাচার হয়ে যাবে বিদেশে।

তাই একটি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করার পাশাপাশি কালো টাকা সাদা করার সুযোগ খুলে দিতে হবে যাতে মানুষ তাদের সঞ্চিত কালো টাকা একটি নির্দিষ্ট কর দিয়ে বৈধ করতে পারে। মানুষ যাতে তাদের সঞ্চিত কালো টাকা দ্রুত বৈধ করে, সেজন্য সরকার সময় সময় এই করহার বাড়াতে পারে। ফলে এই ধরণের যুগপৎ দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের গতি, ব্যাপ্তি এবং আওতা যতোই বাড়তে থাকবে, দেশের অর্থনীতিতে কালো

টাকার প্রবাহও ততো কমতে থাকবে। ফলে এমন এক দিন আসবে যখন দেশের অর্থনীতিতে কোন কালো টাকা থাকবে না।

সরকারের তখন উচিত হবে কালো টাকা সাদা করার এই সুযোগ চিরতরে বিলুপ্ত করা। এরপর থেকে সরকার বিভিন্ন উপায়ে নাগরিকদের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে বৈষম্য তালাশ করবে এবং এই পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করবে। ফলে কারো পক্ষে দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বর্তমান সরকার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিলেও অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন যে, একটি কার্যকরী দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ছাড়া কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার আসলে কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। তাই কালো টাকা সাদা করার পক্ষে-বিপক্ষে অহেতুক আলোচনা এবং সময় নষ্ট না করে সবার উচিত একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের দাবী তোলা।

একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান চালু করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে সঞ্চিত কালো টাকা যাতে দ্রুত সাদা হয়, তার জন্য সরকারের উচিত এই কালো টাকা যাতে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সাদা হয়, তার ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে খাতগুলির জরিমানার হারে বৈষম্য এনে সরকার কালো টাকার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কালো টাকা সাদা করার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেখানো হয়, তার আসলে তেমন কোন ভিত্তি নেই। বরং এই ধরণের প্রচারণার কারণে আগামীতে সরকার এমন ভুল করে বসতে পারে যাতে দীর্ঘমেয়াদে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে ঘুষের লেনদেন যেমন একটি বাস্তবতা, তেমনি করফাঁকিও একটি বাস্তবতা। তাই আমাদের সকলের উচিত এই দুটি বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে এর সমাধান কি করে হতে পারে, সেই ব্যাপারে আলোচনা করা। তবে সাম্প্রতিককালে করফাঁকির বাস্তবতাকে স্বীকার করতে গিয়ে এই অপরাধকে মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে যা সমর্থনযোগ্য নয়। এই ধরণের প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কেউ আর কর দিতে উৎসাহবোধ করবে না।

একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া কালো টাকা সাদা করার কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই - এই তত্বটির একটি দুর্বলতা রয়েছে। সরকার যদি কালো টাকার মালিকদেরকে তিরস্কৃত করার পরিবর্তে পুরস্কৃত করতে থাকে, তাহলে কোন প্রকার দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে। এর জন্য কোন প্রকার ভয়ভীতি দেখানোর প্রয়োজন পড়বে না।

সম্প্রতি সরকার শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দিয়েছে, তাতে কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে উল্টো পুরস্কৃত হতে পারেন। এই সুযোগ দেয়ার ফলে শেয়ার বাজারকে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে যাতে লাভবান হতে পারেন বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা যারা শেয়ারবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

দুর্নীতি দমন অভিযান চালু করে কালো টাকা সাদা করতে দেয়ার পাশাপাশি প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রম আনতে হবে। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে ক্ষমতার ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তাদের বেতন ভাতা এবং জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এভাবে বেতন ভাতা বাড়ানোর পদক্ষেপ বাস্তবসম্মত না-ও হতে পারে। তাই আগেই বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে আনতে হবে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে। সেই সাথে সরকারি সেবা নেয়ার জন্য সার্ভিস চার্জের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সরকারি অফিসাররা তাদের দক্ষতা যেমন বাড়াবেন, তেমনি তারা নতুন নতুন সেবাদানেও উৎসাহিত হবেন।

সমাজ থেকে সহজে দুর্নীতি দুর করার জন্য সকলের নৈতিকতাবোধ বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। সমাজে নৈতিকতার উন্নয়ন কি করে হতে পারে, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হতে পারে। তবে আমরা মনে করি, সমাজে সকলের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত করা গেলে নৈতিকতার খুব দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। বিশেষ করে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের সকল বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখছেন এবং আমাদের মৃত্যুর পর সবাইকে তার সামনে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, এই বিশ্বাসটি সকলের মনে জাগ্রত করা গেলে সবাই নিজ থেকেই নিজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

এই ধরণের বিশ্বাস সকলের মনে জাগ্রত করা গেলে সমাজে দুর্নীতি কমানোর জন্য সরকারের মোট খরচ হবে অনেক কম। এই বেঁচে যাওয়া টাকা সরকার তখন ব্যবহার করতে পারবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে।

তাই সমাজ থেকে সহজে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ধর্মের পক্ষে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

প্রথম পর্ব

১.১ অবয়বহীন দুর্নীতি
১.২ প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা
১.৩ রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার

১.১. অবয়বহীন দুর্নীতি

বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞামতে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি বলে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন রাজনীতিবিদ যখন কাউকে অর্থের বিনিময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কণ্ট্রাক্ট পাইয়ে দেন, তখন তিনি দুর্নীতি করেন।

একজন সরকারি অফিসার যখন অবৈধ টাকার নেশায় নিজের টেবিলের ফাইল আটকে রাখেন, তখন তিনিও দুর্নীতি করেন। কারণ তাকে দেয়া জনগণের ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করছেন।

তবে দুর্নীতির এই সংজ্ঞার পরিধি শুধুমাত্র জনপ্রশাসন কিংবা রাজনৈতিক গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি আরও অনেক ব্যাপক।

একজন ব্যবসায়ী যখন খাদ্যে ভেজাল মেশান, তখন তিনি তার ভোক্তার অধিকারকে পাশ কাটিয়ে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাই এটাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

এনজিও মালিকরা যখন দারিদ্র্য বিমোচনের নামে টাকা এনে তা নিজেদের ভোগ বিলাশে ব্যয় করেন, তখন সেটাও দুর্নীতি কারণ এই টাকার মুল দাবীদার দেশের দরিদ্র জনগণ।

আবার একজন সাংবাদিক যখন পাঠকের সঠিক সংবাদ পাওয়ার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে নির্জলা মিথ্যা লেখা ছাপিয়ে তার কলমের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তখন সেটাকে দুর্নীতি না বলে কি বলবেন?

তবে যেহেতু রাজনীতিবিদরা এবং সরকারি অফিসাররা একটি দেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার মালিক, তাই তাদের দুর্নীতি নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। দুর্নীতির শুরুটাও এই দুটি ক্ষেত্র থেকে। তাই ধরে নেয়া হয় এই দুটি যায়গাতে যদি একটি কার্যকরী দুর্নীতি নির্মুলের ঔষধ দেয়া যায়, তাহলে সেই ঔষধ ধীরে ধীরে অন্যান্য সকল খাতেই ক্রিয়া করবে।

অবয়বহীন দুর্নীতি

দুর্নীতি অনেকটা শারীরিক ব্যাধির মতো। ডাক্তার রোগের সিম্পটম দেখে ঔষধ দেন। কিন্তু সেই ঔষধে সত্যিই কাজ হবে কিনা তা বোঝা যায় ঔষধটি খাবার পর।

দুর্নীতি এমনই। এর সমাধানের কৌশলগুলি আদৌ কাজ করবে কিনা, তা মূলত বোঝা যায় কৌশলগুলি প্রয়োগ করার পর। কারণ দুর্নীতি এমন একটা রোগ যাকে কোন গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর সাথে যেমন জড়িয়ে আছে ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মতো এমন বিষয় যাদেরকে সংখ্যায়িত করা যায় না, তেমনি জড়িয়ে আছে মানুষের নৈতিকতা যার কোন অবয়ব নেই।

তাই একটি বিভাগে একজন অতি দুর্নীতিবাজ কর্মকতার পাশের রুমেই হয়তো আছেন আরেকজন কলিগ যিনি হতে পারেন সম্পূর্ণ সৎ। আবার দুর্নীতিবাজদের মধ্যেও হেরফের রয়েছে। একই বিভাগের একজন বেশি দুর্নীতিবাজ। কিন্তু আরেকজন হয়তো বা দুর্নীতিতে তার থেকে পিছিয়ে।

দুর্নীতির এই অবয়বহীনতার কারণেই এখন পর্যন্ত দুর্নীতির সোজাসাপ্টা কোন গাণিতিক সমাধান বের করা যায়নি। দেখা গেছে একটি কৌশল এক দেশে কাজ করলেও অন্য দেশে তা ফল দেয়নি।

দুর্নীতি মাপক

কোন দেশে একটি বছরে কি পরিমাণ কালো টাকা বা অপ্রদর্শিত আয় তৈরী হচ্ছে, তার হিসাব যদি বের করা যেত, তাহলে দুর্নীতির একটি গ্রহণযোগ্য সূচক তৈরী করা যেত। কিন্তু সমস্যা হল এই কালো টাকার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা খুব কঠিন। কারণ ধরে নেয়া হয়, যারা কালো টাকা আয় করছেন, তাদেরকে এর পরিমাণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনোই এর সঠিক জবাব দেবেন না।

এই সমস্যাটি কাটানোর জন্য দুর্নীতি মাপার জন্য ধারণা বা পারসেপশনকে (Perception) ব্যবহার করা হয়। এই পন্থার দুর্বলতা অবশ্যই আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন পদ্ধতি আবিস্কার করা যায়নি, যা এই প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক উন্নত।

ধারণার উপর ভিত্তি করে এ ধরণের একটি মাপক হল করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (Corruption Perceptions Index) বা দুর্নীতির ধারণার সূচক। জার্মানীর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রবর্তক। বিশ্বজুড়ে এই সূচকটি ইতিমধ্যেই বেশ

গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দুর্নীতিতে অন্যান্য আরো যে সকল সূচক রয়েছে, সেই সকল সূচকের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ফলাফলগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিল রয়েছে।

এই সূচকে যে সকল দুর্নীতি ধরা পড়ে তা মূলত ঘুষ, টেন্ডারবাজি, টাকাপাচার, জমিদখল ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরের দুর্নীতি এই সূচকে ধরা পড়ে না। এটি এই সূচকটির একটি বড় দুর্বলতা।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবত এই সূচকে সবচেয়ে নীচের অবস্থানে ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে সকলের জানা থাকা ভাল এটি একটি ধারণা সূচক হওয়ার কারণে নিম্ন সারির দুর্নীতিগ্রস্থ দেশগুলির মধ্যে আসলে তেমন কোন তফাত নেই। তাই এই সূচকে সামান্য উন্নতি একটি সুসংবাদ হলেও এনিয়ে খুব বেশি হইচই করার কিছু নেই।

দুর্নীতির প্রভাব

দুর্নীতি অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। একজন এতে আক্রান্ত হলে অন্য আরেকজন সহজেই এতে আক্রান্ত হয়। আর যখন এই ব্যাধি সমাজের সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে যায়, তখন তার প্রভাব হয় সুদুরপ্রসারী। এমনকি দুর্নীতির সর্বগ্রাসী বিস্তার জাতীয় নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করতে পারে।

দুর্নীতির সবচেয়ে বড় কুপ্রভাব হল এটি মানুষের নৈতিকতাবোধকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। ফলে একজন মানুষকে টাকা দিয়ে কেনা তখন খুব সহজ হয়ে যায়।

সমাজের নের্তৃস্থানীয় একটি বিশাল অংশকে যদি এভাবে কিনে ফেলা যায় তাহলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পড়বে জাতীয় জীবনে। ফলে বাড়বে অস্থিরতা, অশান্তি, কমবে সামাজিক নিরাপত্তা।

রাজনীতি ও দুর্নীতি

বর্তমানের রাজনীতি দুর্নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সৎ এবং দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত রাজনীতিবিদ এখন যেন কল্পনাই করা যায় না।

সাম্প্রতিককালে নের্তৃস্থানীয়, প্রভাবশালী কম বেশি সকল রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এর অনেক অভিযোগই হয়তো ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে সাধারণ মানুষ এই সকল অভিযোগ অবিশ্বাস করেনি।

সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা যে দিন দিন কমছে, তা আর নতুন কোন বিষয় নয়। রাজনীতিবিদদেরকে টেক্কা দিয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে রয়েছেন ধর্মীয় নেতা কিংবা বুদ্ধিজীবীরা, এ ধরণের প্রবণতা অতীতের বিভিন্ন জরিপে পাওয়া গেছে।

রাজনীতিবিদদের উপর এই ধরণের আস্থাহীনতা দীর্ঘদিন বজায় থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হবে। এই আস্থাহীনতার কারণে রাজনীতিবিদদের কথা মানুষ আর মূল্য দেবে না। তাই জাতীয় দুর্যোগে যেমন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজে সম্ভব হবে না, তেমনি দেশকেও একটি অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই রাজনীতিবেদদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তাদেরকে যথাসম্ভব দুর্নীতিমুক্ত থাকা প্রয়োজন।

দায়ী কে?

বর্তমানের দুর্নীতিগ্রস্থ সিস্টেমের জন্য আমরা সকলেই কমবেশি দায়ী। এর জন্য শুধু রাজনৈতিক নের্তৃত্বকে দায়ী করলেই চলবে না। বরং রাজনীতিবিদদেরকে দুর্নীতিতে উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যবসায়ী সমাজ এবং আমলারাও একই দোষে দোষী। সেই সাথে যারা দুর্নীতি করেননি, কিন্তু দুর্নীতির ব্যাপারে চুপ করে ছিলেন, তাদের দোষও হালকা করে দেখা যাবে না। কারণ তারা ছিলেন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতির সুবিধাভোগী।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার।

দুর্নীতিবাজ বলতে আমরা চট করে ধরে নেই যে দুর্নীতি করেছে সেই দুর্নীতিবাজ। আর বাকিরা সকলেই সৎ।

ব্যাপারটা এতোটা সহজ নয়।

যারা দুর্নীতি করেছেন, তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, তা ঠিক। তবে যারা দুর্নীতি করেননি, তাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাদের হয়তো দুর্নীতি করার কোন সুযোগই ছিল না, কারণ তাদের হাতে কখনোই কোন ক্ষমতা ছিল না। ক্ষমতা যদি নাই থাকে, তাহলে দুর্নীতি করার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। কারণ ক্ষমতার অপব্যবহারই তো দুর্নীতির জন্ম দেয়।

আমাদের দেশে কিন্তু দ্বিতীয় দলের জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আমাদের মধ্যে যারা দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক, স্টুডেন্ট কিংবা গৃহশিক্ষক, তারাই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর হাতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই। তাই তারা যেমন ক্ষমতাহীন, তেমনি সেই ক্ষমতা অপব্যবহার বা দুর্নীতি করারও তাদের কোন সুযোগ নেই।

আর যারা ক্ষমতাবান তাদের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। এর মধ্যে যেমন রয়েছেন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পপতি, বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, তেমনি রয়েছেন রাজনীতিবিদরা।

তাই প্রকৃত সৎ ব্যক্তি তিনিই যার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তিনি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন না। অতএব, এই মাপকাঠি ব্যবহার করে আমরা যদি সমাজে সৎ এবং অসৎ ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই, তাহলে সমাজে যাদের কোন ক্ষমতা নেই, সেই বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই হিসাব থেকে পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। ফলে বাকি থাকবেন শুধু তারাই যাদের ক্ষমতা রয়েছে। এই সংখ্যায় অল্প ক্ষমতাধরদের মধ্যে যারা ক্ষমতা অপব্যবহার করছেন না, তারাই প্রকৃত সৎ ব্যক্তি। আর যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, তারা অসৎ।

এখন আমরা যদি এমন সৎ মানুষ খুঁজতে থাকি, তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে সমাজের এই ক্ষমতাধরদের মধ্যে প্রকৃত সৎ ব্যক্তির সংখ্যা আসলে খুবই কম।

আমার এই ধরণের অপ্রিয় সত্য কথা বলা ফেলাতে অনেকে আহত পারেন, কিন্তু এটাই আমাদের বাস্তবতা।

দুর্নীতি দমন অভিযান

দুর্নীতির বর্তমান অবস্থা একটি দীর্ঘমেয়াদী চর্চার ফসল হলেও, ক্ষমতায় যারা থাকবে দুর্নীতি দমনের দায় তাদেরই। তাই বর্তমান সরকারকেও এই দায়দায়িত্ব নিতে হবে। এখানে অন্য কোন অতীত সরকারের উপর দায় চাপিয়ে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

আমরা যদি এখন অতীতের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকারের দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব অতীতের কোন সরকারের আমলেই আসলে দুর্নীতি কমানোর ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। যা নেয়া হয়েছিল, তার

সবগুলোই ছিল মূলত লোক দেখানো। এই বিচারে বলা যায় সাবেক তত্বাবধায়ক সরকার তাদের দায়িত্ব বেশ ভালভাবেই পালন করেছিলেন।

বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে যেমন নতুন আকারে সাজানো হয়েছিল তেমনি সরকারের সর্বস্তরে দুর্নীতি দমনকে একটি প্রধান এজেন্ডা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

ফলে অনেক শীর্ষ রাজনীতিবিদ যেমন জবাবদিহিতার আওতায় এসেছিলেন, তেমনি সর্বসাধারণের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে কেউই জবাবদিহিতার উর্দ্ধে নন।

এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের আমলেও একই ধরণের মানমানসিকতা কাজ করেবে কিনা?

এটা যদি না করে, তাহলে তা হবে খুবই দুঃখজনক।

দুর্নীতি দমন কমিশন

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল যে একটি শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন থাকলেই বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি দুর হয়ে যাবে। এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডেলে সঠিক। যেমন অতীতে সিঙ্গাপুর এবং হংকং'য়ে মূলত একটি শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে দুর্নীতি দমনে সফলতা অর্জন করা গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর এবং হংকং'য়ের মতো দেশগুলোতে যখন দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করে দুর্নীতি দমনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়, তখন সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েনি। তাই শুরুতেই এই ধরণের একটি কর্মসূচির কারণে দুর্নীতি দমনের কাজটি তখন এতোটা কঠিন ছিল না।

কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশের জন্য এই ধারণাটি প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য এই ধারণা ঠিক নয়।

কারণ বাংলাদেশ একদিকে দরিদ্র, অন্যদিকে জনবহুল। অনেক দেশের মোট জনসংখ্যা বাংলাদেশের একটি মাত্র জেলার মোট জনসংখ্যার সমান। তাই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বিপরীতে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের আয়তন নিতান্ত কম থাকাতে বাংলাদেশের ক্ষমতাধররা প্রচুর ক্ষমতার মালিক। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ক্ষমতার সাথে বেতন কাঠামো এবং জবাবদিহিতার সমন্বয় না করাতে দুর্নীতি এখন বাংলাদেশে সর্বব্যাপী।

তাই একটি মাত্র দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনে তেমন একটা সফল হওয়া সম্ভব নয়। বরং এই ধরণের কমিশন মানুষের মনে ধীরে ধীরে অনাস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়।

বিগত সরকারের সময়ে যখন দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠিত করা হয়, তখন মানুষের মনে এই কমিশনটির ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফলে পুনর্গঠিত কমিশন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ পেতে থাকে। কিন্তু কমিশনের পক্ষে প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করা সম্ভব ছিল না।

তাই যে সকল নাগরিক অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু সেই অভিযোগের কোন প্রকার ফল পাননি, তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই এই ধরণের প্রবণতা যদি আরো দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে এমন একটা সময় আসতো, যখন সমাজের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতো যে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আসলে কোন কার্যকর প্রতিষ্ঠান নয়।

আমার মতে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ দুর্নীতি দমন করা নয়। বরং দুর্নীতি না করার ব্যাপারে জনগণকে ভয় দেখানোই দুর্নীতি দমন কমিশনের মূল কাজ।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী এই কাজটিই সফলভাবে করেছিলেন। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর কার্যকরভাবে সবাইকে ভয় দেখাতে পেরেছিলেন। সবাই তাকে ভয় পেত।

খুব সম্ভবত তার এই কার্যকরভাবে ভয় দেখানোর প্রতিশোধ এখন নেয়া হচ্ছে উল্টো তাকে এবং তার তৎকালীন সহকর্মীদের ভয় দেখানোর মাধ্যমে। এই ধরণের বিপরীতমুখী ভয় দেখানোর সংস্কৃতি বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে কোন দুর্নীতি কমিশনের চেয়ারম্যানই আর কার্যকরভাবে ভয় দেখাবেন না। ফলে দুর্নীতিও কমবে না। আর বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটি সমস্যা দুর্নীতি যদি না কমে তাহলে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, উন্নত, ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য

দুর্নীতির দমনের ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য কি, তা এখনই ঠিক করতে হবে।

আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি সমাজ থেকে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল করতে চাই, নাকি এমন দুর্নীতির সাথে ভবিষ্যতে সহাবস্থান করতে চাই। আমাদেরকে ঠিক করতে হবে দুর্নীতি পরিমাপের সুচকে আমরা নিজেদেরকে আগামীতে কোন অবস্থানে দেখতে চাই।

আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দুর্নীতি পরিমাপের সুচকে শুধুমাএ কয়েক ধাপ উন্নতি করেই কি আমরা আমাদের দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা থামিয়ে দিতে চাই, নাকি ভবিষ্যতে দুর্নীতিহীন দেশ হিসাবে যে সকল দেশের সুনাম আছে, সেই সকল দেশের কাতারে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চাই।

দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত আমাদের রাজনৈতিক নের্তৃত্বকেই নিতে হবে।

দুর্নীতির অদৃশ্য হাতি

সমাজের সকল স্তরে যখন দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে তুলনা করা যায় একটি অদৃশ্য হাতির সাথে। এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, কিন্তু এর আকার কি রকম, কতো বড়, তার সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

তাই দুর্নীতির সমাধান দিতে গিয়ে অনেকে এই অদৃশ্য হাতিটির একটি অংশের কথা বলেন, কিন্তু বাদ দিয়ে দেন আরেকটি অংশ। ফলে দুর্নীতির সমাধানও হয় অনেক কঠিন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এই অদৃশ্য হাতিটির আকার এবং আকৃতি এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় যা জনসাধারণ এমনকি নীতিনির্ধারকদের জন্যও বোঝা অনেক কঠিন হয়ে যায়।

নীতিনির্ধারকদেরকে যদি দুর্নীতি দমনে উৎসাহিত করতে হয় তাহলে সবার আগে প্রয়োজন তাদেরকে সহজ ভাষায় দুর্নীতির সমাধান বাতলে দেয়া। এতোদিন আমাদের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে দুর্নীতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন, তার একটি অন্যতম কারণ তাদেরকে দুর্নীতির কোন সোজাসাপ্টা সমাধান আসলে কেউ বাতলে দিতে পারেননি।

সেইসাথে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার।

দুর্নীতি নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা মূলত অর্থনীতিবিদ কিংবা সমাজবিদ। তারা নীতিনির্ধারক নন। তাই সত্যিকারের দুর্নীতি দমন করতে হলে এই নীতিনির্ধারকদেরকেই সবার আগে বোঝাতে হবে দুর্নীতি দমনের প্রয়োজনীয়তা। সেই সাথে তাদের মধ্যে তৈরী করতে হবে দুর্নীতি দমনের সদিচ্ছা। যারা নীতিনির্ধারণ করেন, তাদের মধ্যে যদি দুর্নীতি

দমনের সদিচ্ছা তৈরী করা না যায়, তাহলে শত সমাধান দিয়েও দুর্নীতি দমনে সত্যিকারের সফলতা লাভ করা যাবে না।

একইসাথে সমাজবিদদেরকে বাতলে দিতে হবে দুর্নীতি দমনের কাজটি আসলেই কোথা থেকে শুরু করতে হবে। তা না হলে এই অদৃশ্য হাতির পায়ের নীচে পিষ্ট হয়েই মারা যাবে দুর্নীতি দমনের সকল কার্যক্রম।

ধন্যবাদ টিআইবি

১/১১ এর পর একটি দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু হলেও দুর্নীতি দমনের প্রয়োজনীয়তার কথা বেশ আগেভাগেই উচ্চারিত হচ্ছিল। বিশেষ করে বিএনপি নের্তৃত্বাধীন বিগত জোট সরকার তাদের নির্বাচনের মেনিফেস্টোতে দুর্নীতি দমনকে প্রধান এজেন্ডা হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সেসময় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগও দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ব্যক্ত করেছিল।

এক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি বড় ধন্যবাদ পাবে। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। এই প্রচারণাকে অনেকেই দেশকে নেতিবাচক হিসাবে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করলেও এর ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

এই অব্যাহত প্রচারণার কারণেই দেশে দুর্নীতি দমনের চিন্তা চেতনার বিস্তার ঘটেছে। ফলে অনেকেই দুর্নীতি দমনের কলাকৌশল নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাই এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারণার পরোক্ষ প্রভাবেই হয়তো সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি দমনের একটি সদিচ্ছার সৃষ্টি হয়েছে।

টিআইবির আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করার দাবী রাখে।

টিআইবির কর্তা ব্যক্তিরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণাকে তাদের প্রধান এজেন্ডা হিসাবে নিয়েছেন এবং তারা তাদের পেশাগত লক্ষ্যের প্রতি সবসময় স্থির রয়েছেন। তারা এর সাথে কোন প্রকার কুটিল রাজনীতিকে জড়াননি। তাই বলা যায়, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটি এখন পর্যন্ত সঠিকভাবেই পালন করেছেন এবং আশা করি তারা তা করবেন।

নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে অন্যের দায়িত্ব নিয়ে সমালোচনা করা কিংবা অন্যের দায়িত্ব নিয়ে টানাটানি করা আমাদের জাতিগত একটি বদ অভ্যাস। তাই এই বদ

অভ্যাস দুর করার জন্য আমাদের সবাইকেই টিআইবির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান

দুর্নীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব চট করে মানুষকে বোঝানো যায়না। বরং আমাদের সমাজের বাস্তবতা হল আমাদের অনেকেই কিন্তু দুর্নীতিকে জিইয়ে রাখার পক্ষে। কারণ দুর্নীতি থাকলে অফিসে যেমন বেআইনি কাজটি করিয়ে আনা যায়, তেমনি পণ্য আমদানী করতে গেলেও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়।

তাই দ্রব্যমূল্য কিংবা বিদ্যুতের স্বল্পতা নিয়ে সমাজে যেমন চট করে হইচই ফেলে দেয়া সম্ভব, তেমনি দুর্নীতি নিয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি করা অনেকটাই কঠিন।

আবার সচেতনতারও প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি জরিপ চালালে হয়তো সকলেই বলবেন তারা দুর্নীতি দমন চান। তাই জরিপের ফলাফলে দেখা যেতে পারে মানুষের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা বেড়ে গেছে।

কিন্তু একই ব্যক্তিরা হয়তো সরকারি সেবা নিতে গিয়ে সবসময় চাইবেন কিভাবে আইন ভঙ্গ করে বেআইনিভাবে তাদের কাজটি করিয়ে আনা যায়।

তাই আমাদের দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে আত্মিকভাবে, বাহ্যিকভাবে নয়। আমাদেরকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে দুর্নীতি আসলে আমাদের সবার জন্যই খারাপ।

এই বিশ্বাস তৈরী করা অনেক কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।

আমরা যদি দুর্নীতির একটু গভীরে যাই, তাহলেই দেখতে পাব, আমাদের চারপাশের সকল সমস্যার মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে কোন না কোন প্রকারের দুর্নীতি। এই সকল সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে।

বর্তমানে যে পানি এবং বিদ্যুৎ সমস্যায় নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে সময়মতো বিদ্যুৎ তৈরীর স্থাপনা এবং পানি শোধনাগার নির্মাণ না করা। দেশে বিদ্যুৎ এবং পানির এতো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই স্থাপনাগুলো কেন এতোদিন নির্মিত হল না, এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে বের হয়ে আসবে অনেক দুর্নীতির খবর।

দেখা যাবে অন্যান্য অনেক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের দিকে কারোর নজর ছিল না।

একই কথা বলা যায় যানজটের ব্যাপারেও।

দেশের শহরগুলিতে যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এটি সবাই চোখে দেখছেন। তাই প্রয়োজন নতুন রাস্তা। কিন্তু তারপরও আমাদের শহরগুলিতে বড় বড় রাস্তা কিংবা ফ্লাইওভার তৈরীর প্রকল্পগুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ যদি আমরা ঘাটতে থাকি, তাহলে দেখা যাবে, এই বড় প্রকল্পগুলি কাকে দেয়া হবে, কে পাবে এতো বড় কন্ট্রাক্ট, সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েই প্রকল্পগুলো আটকে গেছে। ফলে জনজীবনে দুর্ভোগের কোন অবসান হয়নি।

আমাদের সড়কগুলিতে যখন দুর্ঘটনা হয়ে মানুষ মারা যায়, তখন তদন্ত করে হয়তো পাওয়া যায় আসলে সেই গাড়ির ড্রাইভারটির কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। এই অবৈধ লাইসেন্স সে আবার পেয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ঘুষ দিয়ে। তাই এই জীবনহানির জন্য এই ছোট্ট দুর্নীতিই অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু আমরা কখনো বিষয়টিকে এভাবে দেখি না।

একই কথা প্রযোজ্য অন্য যে কোন দুর্ঘটনার বেলাতেও। লঞ্চ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী যেমন লঞ্চের এুটিপূর্ণ কাঠামো যা কিনা আবার ঘুষ দিয়ে পাশ করিয়ে আনা হয়েছে, তেমনি বাড়ি ধ্বসে পড়লে কিংবা ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগলেও দেখা যাবে এর জন্য মালিক পক্ষের সাথে সরকারি বিভাগের অবৈধ আতাতই মুলত দায়ী।

তাই আমরা যদি আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, এবং আত্মীয়-স্বজনদের এই ধরণের অপমৃত্যু এড়াতে চাই, নিজেদের জীবনকে যদি দুর্ভোগমুক্ত করতে চাই, তাহলে দুর্নীতির বিপক্ষে না যাওয়া ছাড়া আসলে আমাদের আর কোন উপায় নেই।

১.২. প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা

বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, এ যেন এখন একটি কল্পনার বিষয়। কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ সেবা নিতে গিয়ে কোন সরকারি অফিসে গিয়েছেন, অথচ তাকে এর জন্য কোন অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয়নি, এ ধরণের কাহিনী শুনলে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

কিন্তু এরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার তো কথা ছিল না। এটা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন, প্রতিটি মানুষই সৎ থাকতে চায়। কিন্তু সে পারেনা বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে। তাই কাউকে দুর্নীতিবাজ বলার আগে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে তার এই ধরণের আচরণের পিছনের কারণগুলি কি।

দুর্নীতির কারণ

দুর্নীতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড: রবার্ট ক্লিটগার্ড একটি সুন্দর ফর্মুলা দিয়েছেন। তার মতে, ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে ব্যবধানই দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

অর্থাৎ কাউকে যদি অসামান্য ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সে সেই ক্ষমতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করছে কিনা তা দেখার জন্য যদি পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ে। তিনি এই সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেছেন নীচের সমীকরণের মাধ্যমেঃ

দুর্নীতি = একচ্ছএ ক্ষমতা + ঐচ্ছিক ক্ষমতা – জবাবদিহিতা

ড: ক্লিটগার্ডের ফর্মুলাকে চিএ ১ এর মাধ্যমে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। চিএটিতে ক্ষমতার কালো বারটির সাথে জবাবদিহিতার ধূসর বারটির যতোক্ষণ ব্যবধান থাকবে, দুর্নীতিও ততোক্ষণ থাকবে।

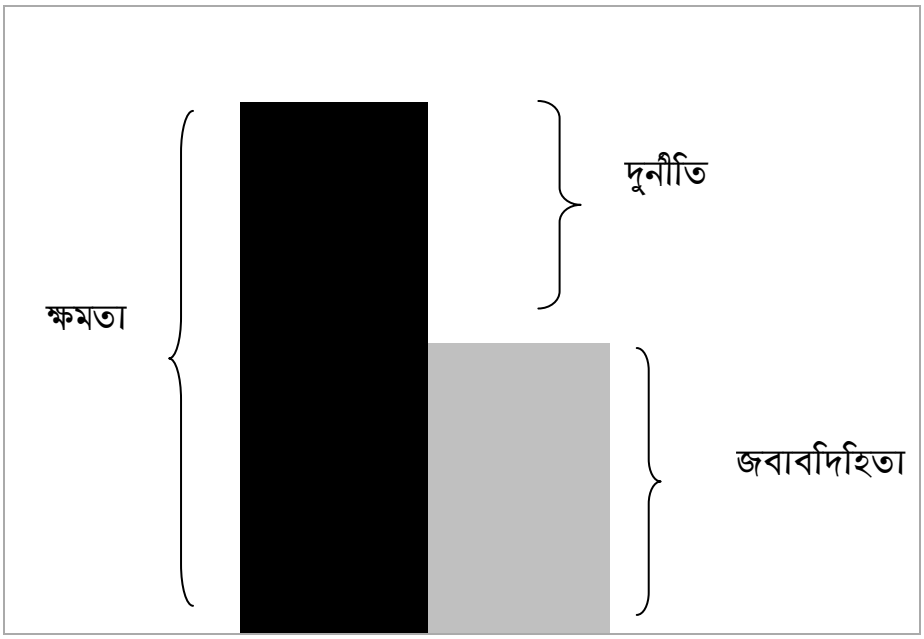

চিএ ১ঃ ক্লিটগার্ড মডেল

তাই ড. ক্লিটগার্ডের মডেল অনুযায়ী দুর্নীতি দমন করার জন্য হয় ক্ষমতার কালো বারটির উচ্চতা নামিয়ে জবাবদিহিতার পর্যায়ে আনতে হবে না হয় জবাবদিহিতার ধুসর বারটির উচ্চতা বাড়িয়ে ক্ষমতার পর্যায়ে আনতে হবে।

ক্ষমতার প্রকারভেদ

ক্ষমতা আবার দুইরকমের। প্রথম, একচ্ছএ ক্ষমতা বা মনোপলি পাওয়ার (Monopoly Power) এবং দ্বিতীয়, ঐচ্ছিক ক্ষমতা বা ডিসক্রেশনারী পাওয়ার (Discretionary Power)।

কোন নাগরিক যদি কোন সেবার জন্য কোন এক বিশেষ সরকারি অফিসার বা বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকেন, তাহলে সেই অফিসার বা বিভাগ একচ্ছএ ক্ষমতা ভোগ করে।

যেমন আমরা চুরির মামলা করার জন্য পুলিশের উপর নির্ভর করি। এ ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। তাই পুলিশ বিভাগ বা এর অফিসাররা এই সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে একচ্ছএ ক্ষমতার অধিকারী।

এই ধরণের একচ্ছএ ক্ষমতার পাশাপাশি অনেক সরকারি অফিসারের আবার ঐচ্ছিক ক্ষমতাও রয়েছে। একটি কণ্ট্রাক্ট কে পাবে কিংবা কি মূল্যে পাবে তা অনেক সময় একজন

ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তাই এক্ষেত্রে সেই সরকারি অফিসারটি ঐচ্ছিক ক্ষমতারও মালিক যার অপব্যবহার তিনি চাইলেই করতে পারেন।

জবাবদিহিতার প্রকারভেদ

জবাবদিহিতাকেও আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, অন্ত: জবাবদিহিতা বা ইন্টারনাল একাউন্টাবিলিটি (Internal Accountability) এবং বহি: জবাবদিহিতা বা এক্সটারনাল একাউন্টাবিলিটি (External Accountability)।

একটি বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকে, তাকে অন্ত: জবাবদিহিতা বলে। কোন কর্মচারী অপরাধ করলে যে জরিমানা বা বরখাস্ত করা হয় কিংবা চুরি আটকানোর জন্য প্রতিনিয়ত যে অডিট করা হয়, এগুলো অন্ত: জবাবদিহিতার উদাহরণ।

অন্যদিকে বহি: জবাবদিহিতা কাজ করে বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন, আইনের শাসন, ন্যায়পাল, প্রভাবমুক্ত মিডিয়া ইত্যাদি বহি: জবাবদিহিতার উদাহরণ। কোন বিভাগে কেউ যদি দুর্নীতি করেন এবং তা যদি সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে ন্যায়পালের গোচরে পড়ে, তাহলে সেই ব্যক্তির কোর্টে শাস্তি হবে। এভাবেই বহি: জবাবদিহিতা দুর্নীতি দমনে সাহায্য করে।

ড. ক্লিটগার্ডের ফর্মুলার পরীক্ষা

এখন ড. ক্লিটগার্ডের ফর্মুলা অনুযায়ী ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতাকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দুর্নীতি আয়ত্তে আনা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, অনেক দেশে এভাবে দুর্নীতি কমলেও অন্যান্য অনেক দেশে এভাবে দুর্নীতি কমেনি।

তার মানে একটাই। নিশ্চয়ই এমন অনেক বিষয় আছে যা ড: ক্লিটগার্ড তার সমীকরণে আনেননি। তাহলে দেখা যাক দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কি কি কারণ থাকতে পারে।

দুর্নীতির অন্যান্য কারণ

(১) বেতন ভাতা

একজন সরকারি অফিসারের *বেতন-ভাতা* যদি কম থাকে এবং তা দিয়ে তিনি যদি তার সংসার চালাতে না পারেন, তাহলে তিনি সহজেই দুর্নীতির দিকে ঝুকবেন। তাই দুর্নীতি দমনের যে কোন মডেলে বেতন ভাতা অবশ্যই থাকতে হবে।

এই বেতন ভাতা কত হবে তা নিয়ে আবার দুই ধরণের মতবাদ আছে।

একটি মতবাদ বলে, একজন অফিসারকে ন্যায্য বেতন ভাতা দিলেই সে আর কোন দুর্নীতি করবে না।

আরেকটি মতবাদ বলে, না। ন্যায্য বেতন যথেষ্ট নয়। একজন অফিসারের যদি দুর্নীতি করে ধরা পড়ার কোন ভয় না থাকে, তাহলে তাকে যতোই বেতন দেয়া হোক, সে দুর্নীতি করবেই।

(২) প্রয়োজন এবং লোভ

দুর্নীতি করার পিছনে শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিক কারণ কাজ করে, তা নয়। এর সাথে যোগসূএ রয়েছে অনেক মানসিক দিকও।

একজন অফিসার যদি তার বেতন দিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তাহলে তিনি দুর্নীতি করবেন। তাই দুর্নীতি মানুষের *প্রয়োজন* দিয়ে তাড়িত হয়।

এই প্রয়োজনের সংজ্ঞা আবার এক একজনের কাছে এক একরকম। একজন কাছে দশহাজার টাকা পর্যাপ্ত মনে হলেও একই গ্রেডের আরেক অফিসারের কাছে তা পর্যাপ্ত মনে নাও হতে পারে।

প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরও মানুষের *লোভ* তাকে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। লোভ ষড়রিপুর একটি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি টাকার লোভ আছে। তাই সুযোগ পেলে সে এই লোভের বশবর্তী হয়ে দুর্নীতি করে।

দুর্নীতি দমনের কোন মডেল তাই তৈরী করতে হলে উপরের ফ্যাক্টরগুলোও সেই মডেলে আনতে হবে। তা না হলে দুর্নীতি দমনের শুধুমাএ কৌশলই ঠিক করা হবে, কিন্তু তাতে

পুরো কাজ হবে না। এতোদিন যতো গবেষণা করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু একসাথে একটি মডেলের আকারে কেউই উপস্থাপন করেননি।

এম এম মডেল

বর্তমানের প্রচলিত দুনীতি দমনের মডেলগুলির এই দুর্বলতার উপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছে এম এম মডেল, যা এই পেপারটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই মডেল অনুযায়ী, দুনীতির কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করতে হলে প্রথমেই তা ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে কারণ দুনীতি করে একজন ব্যক্তি, কোন প্রতিষ্ঠান নয়।

ব্যক্তিগত কারণগুলো চিহ্নিত করার পর এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলোর।

তাই একজন অফিসারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন দুনীতি করেন, তাহলে প্রথমেই জবাব আসবে, *প্রয়োজন আছে বলেই করি*।

এরপর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার তো মাসে ত্রিশ হাজার টাকা হলেই চলে যায়, তাহলে আশি হাজার টাকা অবৈধভাবে আয় করেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে বলবেন, *আসলে সুযোগ পেলে তখন নিজেকে আর সামলাতে পারি না*।

অর্থাৎ, দুনীতির প্রথম দুই কারণ হলঃ প্রয়োজন এবং লোভ। প্রয়োজনের দুনীতি এবং লোভের দুনীতির যোগফলই হল মোট দুনীতি।

প্রয়োজন ও লোভের উৎপত্তি

প্রয়োজনের দুনীতি হয় যদি একজন অফিসারকে ন্যায্য বেতনের কম বেতন দেয়া হয়।

অন্যদিকে লোভের দুনীতি হয় যদি একজন অফিসারকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়, কিন্তু সেই ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জবাবদিহিতার কাঠামো যদি না থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতার

অপব্যবহার করে টাকা আয় করার লোভ দমন করার জন্য সঠিক জবাবদিহিতার মধ্যে তাকে আনতে হবে।

আবার এই ক্ষমতার সাথে যদি বেতন কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকে তাহলে জবাবদিহিতা এবং ন্যায্য বেতন থাকা সত্ত্বেও অফিসারটি লোভের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে।

এই পুরো ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য চিত্র ২ দেখা যেতে পারে। এখানে আগের মতোই ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার বার রয়েছে। তবে এর সাথে যোগ হয়েছে বেতন ভাতার বার।

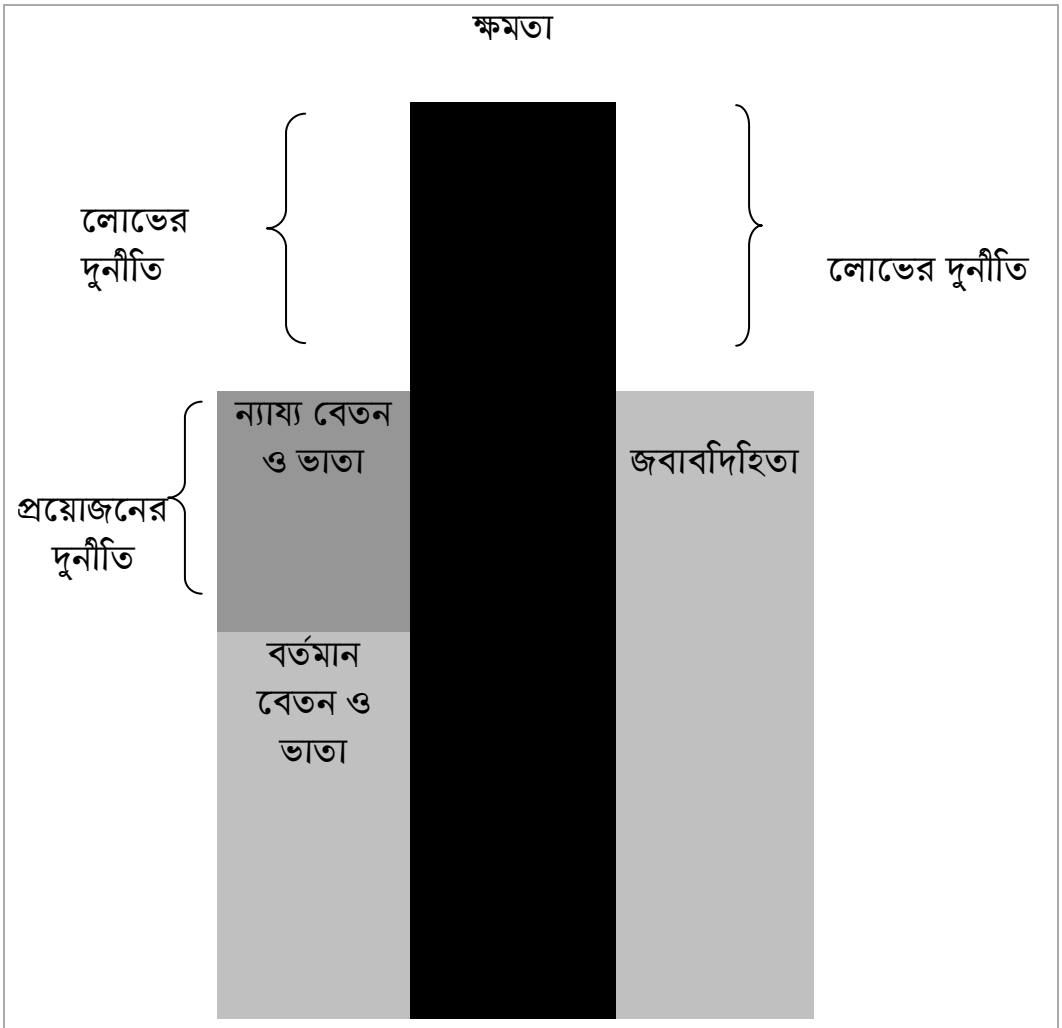

চিত্র ২ঃ এম এম মডেল

প্রয়োজনের দুর্নীতি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ বর্তমান বেতন ভাতা ন্যায্য বেতন ভাতা থেকে কম থাকবে।

আবার ন্যায্য বেতনের সাথে যদি অফিসারের ক্ষমতার বিস্তর ব্যবধান থাকে, তাহলে তা সৃষ্টি করবে লোভের দুর্নীতির। এই লোভের দুর্নীতি পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার অভাবের কারণেও সৃষ্টি হতে পারে।

উপরের সকল বক্তব্য ছোট করে আনলে দাঁড়ায়,

যে বিভাগ বা অফিসারের ক্ষমতা অত্যধিক, সেই বিভাগ বা অফিসারের জবাবদিহিতা এবং বেতন ভাতাও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হতে হবে। সুতরাং সকলকে একই বেতন কাঠামো এবং একই জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে রাখলে দুর্নীতি কমবে না। দুর্নীতি কমাতে হলে ক্ষমতার ক্রমানুসারে বিভাগওয়ারী ভিন্ন ভিন্ন বেতনভাতা এবং জবাবদিহিতার কাঠামো থাকতে হবে।

এটাই সম্প্রতি উদ্ভাবিত *প্রশাসনে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের এম এম মডেল*।

এম এম মডেলকে নীচের সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

দুর্নীতি = প্রয়োজনের দুর্নীতি + লোভের দুর্নীতি

দুর্নীতি = (ন্যায্য বেতন – বর্তমান বেতন) + [(ক্ষমতা – ন্যায্য বেতন) + (ক্ষমতা – জবাবদিহিতা)]

ক্ষমতার মাপক

এম এম মডেল অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগকে ক্ষমতার ক্রম অনুসারে সাজিয়ে তার সাথে জবাবদিহিতা এবং বেতন ভাতার সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষমতা কিভাবে মাপা হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে। এই সমস্যা কাটানোর জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ যাদের উপর রয়েছে, সেই জনগোষ্ঠির পরিমাণকে ক্ষমতার মাপক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

যেমন দেশের প্রতিটি মানুষ তার নিরাপত্তার জন্য র‍্যাব এবং পুলিশের উপর নির্ভরশীল। তাই দেশের প্রতিটি মানুষের উপর এই দুটি বিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তাই তাদের ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি।

আয়কর বিভাগের ক্ষমতা পুলিশ বা র‍্যাবের চেয়ে কম কারণ এদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ শুধুমাত্র যারা আয়কর দেন তাদের উপর সীমাবদ্ধ।

আবার কাস্টমসের ক্ষমতা আরো কম। কারণ এদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ শুধুমাত্র ব্যবসায়ী এবং আমদানীকারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এই মাপক অনুযায়ী ডাক বিভাগের ক্ষমতা খুবই কম। কারণ যাদের উপর তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন, তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য।

তবে এই মাপকের সমস্যা হল এর মাধ্যমে ঐচ্ছিক ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। এই মাপক অনুযায়ী যোগাযোগ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা কম। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এর কারণ এই দুটি বিভাগে সরকারের বরাদ্দ অনেক বেশি। ফলে এই বিভাগের অফিসারদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই দুর্নীতিও বেশি।

এম এম মডেলের পরীক্ষা

বিশ্বের সাতষট্টিটি দেশের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই মডেলের কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর সাথে এটাও দেখা গেছে, দুর্নীতি দমনে বহি: জবাবদিহিতার চেয়ে অন্ত: জবাবদিহিতা ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী।

এতে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনার ঘরে চুরি হচ্ছে কিনা তা ধরার জন্য একটি ব্যবস্থা যদি আপনি নিজের ঘরেই গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সেই চুরি আটকানোর জন্য আপনাকে বাইরের পুলিশ বা অন্যদেরকে ডাকার দরকার নেই।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে যা এই মডেলের কার্যকারিতার প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কিত দুটি উদাহরণ দেয়া যাক।

র‍্যাবের উদাহরণ

বিগত সরকারের আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র‍্যাব গঠন করার পর এর সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে থাকে। এর কারণ খুব সাধারণ। র‍্যাবকে

সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য তখন ক্রসফায়ারের মাধ্যমে সন্ত্রাসী হত্যা করার ওপেন লাইসেন্স দিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের ক্ষমতার কালো বারটি ছিল অনেক উঁচু। শোনা যায়, পুলিশের চেয়ে র‍্যাবকে বেতন-ভাতাও কিছুটা বেশি দেয়া হয়।

কিন্তু তবুও র‍্যাব সদস্যরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছিলেন কারণ দীর্ঘদিন তাদের জন্য জবাবদিহিতার কোন কাঠামো ঠিক করা ছিল না। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে লোভের দুর্নীতির সুযোগ তাদের অনেক বেশি ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে র‍্যাবের জন্য একটি কঠোর জবাবদিহিতা কাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে র‍্যাবের ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে ব্যবধান অনেক কম। নেই বললেই চলে।

তাই দুর্নীতি কমেছিল কিন্তু একেবারে কমে যায়নি। কারণ তাদের বেতন ভাতা বেশি হলেও ক্ষমতার তুলনায় হয়তো সেই বেতন এখনও অনেক কম। ফলে অনেকেই হয়তো এই বেতনকে পর্যাপ্ত বলে ভাবছেন না। তাই প্রয়োজনের দুর্নীতি না থাকলেও লোভের দুর্নীতির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।

কিন্তু তত্বাবধায়ক সরকার আসার পর র‍্যাবের ক্রসফায়ারের ঘটনা তেমন একটা ঘটেনি। ফলে তাদের ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক কমেছিল। খুব সম্ভবত এই কারণে র‍্যাবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির খুব একটা অভিযোগ তখন শোনা যায়নি। ইদানিং র‍্যাবের বিরুদ্ধে আবারো ক্রসফায়ারের অভিযোগ উঠছে। তাই আমার মতে, র‍্যাবের এই ক্ষমতা বাড়ার সাথে যদি তাদের বেতন ভাতা এবং জবাবদিহিতার সমন্বয় না থাকে, তাহলে আবারো সৃষ্টি হবে দুর্নীতির সুযোগ।

সেনাবাহিনীর উদাহরণ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা অন্যান্যদের চেয়ে অনেক কম ক্ষমতা ভোগ করেন। তারা থাকেন নিজেদের ক্যান্টনমেন্টে। সেখানেই তাদের বসবাস, কাজকর্ম। তাই তাদের ক্ষমতার কালো বার অনেক ছোট।

তাদের বেতন অন্যান্যদের সমান হলেও ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। তাই বেতন-ভাতার সাথে ক্ষমতার ব্যবধান কম। ফলে প্রয়োজন এবং লোভের দুর্নীতির সুযোগও কম।

তাদের অন্তঃ জবাবদিহিতার কাঠামোও অনেক শক্তিশালী। তাই ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে ব্যবধান কমে লোভের দুর্নীতি কম। ফলে সেনাবাহিনীতে মোট দুর্নীতির পরিমাণ অন্যান্য বিভাগগুলির চেয়ে অনেক কম বলে ধারণা করা হয়।

কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে ওপারেশন ক্লিন হার্টের সময় এই বাহিনীর সদস্যরা ব্যারাকের বাইরে চলে এসেছিলেন। তাই জনসাধারণের সাথে সংযোগের কারণে তাদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ফলে ক্ষমতার কালো বারটি উঠে যায় অনেক উঁচুতে।

তাই সেসময় সৃষ্টি হয়েছিল লোভের দুর্নীতির সুযোগ। এই সুযোগ তখন অনেক সেনা সদস্যই কাজে লাগিয়েছিলেন এবং পরে তাদের শাস্তি হয়েছিল। হতে পারে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনাসদস্যদের জবাবদিহিতা আগের চেয়ে অনেক বাড়ানো হয়েছিল। তাই সেই পরিস্থিতিতে যৌথবাহিনীর দুর্নীতির অভিযোগ খুব একটা মিডিয়াতে আসেনি।

দুর্নীতি নির্মুল কি সম্ভব?

এম এম মডেলে বেতন ভাতা, ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি নেই, তা নির্ধারণ করতে হবে ধারণা বা পারসেপশনের উপর ভিত্তি করে। কারণ কোনটি ন্যায্য বেতন, কোনটি নয়, সেই ব্যাপারটি যেমন আপেক্ষিক, তেমনি কোন ক্ষমতাধর বিভাগকে কতটুকু বেতন বাড়াতে হবে, সেই ব্যাপারটিও ধারণার উপর নির্ভরশীল।

ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বলে এটাও বলা যায় এই মডেলের মাধ্যমে দুর্নীতি হয়তো নির্মুল করা সম্ভব হবে না, কিন্তু গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা যাবে।

তবে এই ব্যাপারটা অনেকটাই তাত্ত্বিক। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে, সরকার প্রধানের যদি দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকে, তাহলে এই তত্বকে ভুল প্রমাণ করে যে কোন দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মুল করা সম্ভব।

দুর্নীতি ও নৈতিকতা

কোন অফিসারকে কতটুকু বেতন ভাতা দিলে তাকে লোভমুক্ত করা যাবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে ব্যক্তির নৈতিকতার উপর। নৈতিকতায় দুর্বল একজন অফিসারকে যখন তার লোভ বিতাড়নের জন্য মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে, তার নৈতিকতাকে উন্নত করা গেলে সেই পর্যায়ে তাকে নিতে খরচ হয়তো হবে ত্রিশ হাজার টাকা।

ফলে সমাজের সকলের নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো গেলে দুর্নীতি দমনে সরকারের মোট খরচ হবে কম। এই বেঁচে যাওয়া টাকা সরকার তখন অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারবে।

তাই দুর্নীতি দমনের জন্য সমাজের সর্বস্তরে নৈতিকতার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

এম এম মডেলের দুর্বলতা

এই মডেলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল এখানে ধরে নেয়া হয়েছে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি দমনের সদিচ্ছা রয়েছে। আপনার ঘরে চুরি ঠেকাতে হলে প্রথমে নিজেকে চুরি করা থেকে বিরত রাখতে হবে। না হলে আপনি যেই ব্যবস্থাই করুন না কেন, তা চুরি আটকাতে পারবে না।

তাই আমাদের নীতিনির্ধারকরা যদি নিজেদেরকে দুর্নীতি থেকে বিরত না রাখেন, তাহলে এই মডেল কেন, কোন মডেলই কাজ করবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটি আপাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সরকারগুলোর মন্ত্রী-মিনিস্টারদের এবং রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি দমনের ইচ্ছাটা সাধারণত কম থাকে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে অন্যএ। এর জবাব পেতে হলে আমাদেরকে নির্বাচনী ব্যবস্থার মুলে যেতে হবে।

এম এম মডেলের কার্যকারিতা

এই মডেলের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দিক হল এর সিম্পলিসিটি। এই মডেলের মাধ্যমে দুর্নীতির সকল কারণকেই একইসাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং এর একটি সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল এই মডেলটির মাধ্যমে দুর্নীতির অদৃশ্য হাতিটির আকার-আকৃতি এবং অবয়ব সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। সেইসাথে এটাও বোঝা যায়, দুর্নীতি দমনের কাজটি আসলেই কোথা থেকে শুরু করতে হবে।

এই মডেলটি শুধুমাএ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে করা হয়নি। বরং বিশ্বের যেকোন দেশের যে কোন প্রকার দুর্নীতিকে এই মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই

এই মডেলের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সমাধান শুধু বাংলাদেশেই কাজে লাগবে না, বরং যেকোন দেশই এই মডেলটি অনুসরণ করতে পারে।

এই মডেলটির আরও একটি শক্তিশালী দিক হল এটি শুধু প্রশাসনের দুর্নীতি নয়, বরং রাজনৈতিক দুর্নীতিসহ দুর্নীতি মাপক সূচকের আওতার মধ্যের দুর্নীতি এবং বাইরের দুর্নীতি, উভয়ই এই মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

মূল কারণ দুর্নীতি

বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মানুষের মেধার সাথে তার নৈতিকতার একটি সরাসরি যোগসূএ রয়েছে। সাধারণত অধিক মেধাবী ছাএ-ছাএী নৈতিকতার প্রশ্নে আপোস করতে রাজি নয়।

এই কারণে বাংলাদেশের প্রশাসনে দুর্নীতি বেড়ে যাওয়াতে এখন আর মেধাবীরা সরকারি চাকুরিকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। ব্যক্তিখাতের তুলনামুলক উচ্চ বেতন মেধাবীদেরকে সরকারি চাকুরি থেকে দুরে সরিয়ে যাচ্ছে, এই কারণটি সবসময় গ্রহণযোগ্য নয়।

মেধাবীরা যদি নৈতিকতার প্রশ্নে আপোস করে, তাহলে সরকারি চাকুরিতে আয়ের সুযোগ ব্যাক্তিখাতের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তারা এতে রাজি নয় বলেই সরকারি চাকুরি এখন চলে যাচ্ছে তুলনামুলক কম মেধাবীদের কবলে।

ফলে সরকার এমন সব গ্রাজুয়েটদের রিক্রুট করছে যারা প্রশাসন চালাতে ততোটা দক্ষ নয় যতোটা দক্ষ এই বিশ্বায়নের যুগে তাদের হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে মানুষের আয়, চাহিদা এবং প্রত্যাশা। ফলে সরকারকে দিন দিন অধিকতর জটিল প্রকল্প এবং সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কিন্তু চাহিদা এবং প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগের মতো আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের প্রশাসন যন্ত্রের এ ধরণের টাইট ডেডলাইনের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা দিন দিন কমছে। এই কারণেই মুলত সরকার প্রতি বছর এডিপি বাস্তবায়ন করতে পারে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূএিতা জন্ম দেয় জ্বালানি এবং সার সঙ্কটের। ফলে অনেক সাফল্য থাকা সত্বেও একটি বা দুটি বড় ব্যর্থতা সরকারের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামায়।

অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের বেলাতে এই ধরণের ধারা দেখা গেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের পর কোন দলই পরপর দু'বার সরকার গঠন করতে পারেনি। অথচ প্রতিটি সরকারেরই সাফল্য ছিল। কিন্তু ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হওয়াতে ভোটার বড় বড় সাফল্যকে ভুলে গেছে। এই সকল ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি কারণের সাথেই দুর্নীতির একটি যোগাযোগ রয়েছে।

তাই ভবিষ্যতে ক্ষমতার মসনদ নিশ্চিত করতে হলে আমাদের রাজনীতিবিদেরকে দুর্নীতি দমনের দিকেই যে ভবিষ্যতে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

১.৩. রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার

রাজনীতিবিদ বললেই আজকাল আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এক ক্ষমতালিপ্সু লোভাতুর চেহারা যিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেন না, সরকারি বরাদ্দ যার কাছে নিরাপদ নয়, এবং যাকে কখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

রাজনীতিবিদদের এই ধরণের ইমেজের কারণে নতুন প্রজন্ম রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, এটি আর নতুন কোন বিষয় নয়। অথচ রাজনীতি দেশসেবার সবচেয়ে কার্যকরী ক্ষেত্র। একজন রাজনীতিবিদ চাইলে একটি সমাজকে যতো দ্রুত পাল্টাতে পারেন, আর কেউ তা পারে না।

রাজনীতিতে দুর্নীতির প্রবল প্রকোপের কারণেই যে রাজনীতিবিদরা সমাজে তাদের আস্থা হারাচ্ছেন, তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। অথচ একসময়ে এই বাংলাদেশেই জন্ম হয়েছিল অনেক সৎ নের্তৃত্বের। নিজেদের শত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনের সততাকে তারা কখনো প্রশ্নবিদ্ধ করেননি।

বাংলাদেশে সেই রকম নের্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে আমাদেরকে রাজনীতির এই বৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। কোন রাজনীতিবিদকে দুর্নীতিবাজ বলার আগে নতুনভাবে দেখতে হবে রাজনীতিবিদদের এ অবস্থার পিছনে কারণগুলি কি।

রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণ

রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণ উৎঘাটন করার জন্য আবার সেই এম এম মডেলের মূলনীতিতেই ফিরে যাওয়া যাক। তার মানে এই দুর্নীতির কারণ উদঘাটনের জন্য একজন রাজনীতিবিদকেই প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হবে সেই একই প্রশ্ন, আপনি কেন দুর্নীতি করেন?

এখানেও সেই একই উত্তর আসবে। অর্থাৎ প্রয়োজন এবং লোভ। তবে রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের দুর্নীতি এতোটা কম নয়। এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এখন দেখা যাক, একজন রাজনীতিবিদের দুর্নীতির প্রয়োজন কতখানি এবং কি কারণে।

(১) এমপির প্রতি প্রত্যাশা

রাজনীতিবিদরা ভোটারের কাছে ভোট চাইতে এসে অনেক ধরণের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর এই সকল অফিশিয়াল প্রতিশ্রুতি তাদেরকে পূরণ করতে হয়। তবে রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্রিজ কালভার্ট তৈরী, ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির বাইরেও ব্যক্তিগত অনেক প্রতিশ্রুতি থাকে বা নতুন তৈরী হয়।

ভোটার সবসময় আশা করে তার এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি তার বিপদে আপদে সবসময় কাছে এসে দাঁড়াবেন। তাই যে কোন প্রয়োজনে তার দ্বারস্থ হলে যে কোন সমস্যার একটি সমাধান আশা করা যায়, এ ধরণের মনোভাব কমবেশি সকল ভোটারের মধ্যেই থাকে।

জনপ্রতিনিধিরা ভোটারের এই মনোভাবের কথা ভালভাবেই জানেন। তাই একজন ভোটার যখন কোন প্রত্যাশা নিয়ে তার কাছে আসে, তখন একজন সচেতন জনপ্রতিনিধির পক্ষে তাকে ফিরিয়ে দেয়া কখনোই সম্ভব হয় না। এই কারণে একজন জনপ্রিয় এমপির বাড়িতে সাধারণত মানুষের ভিড় লেগেই থাকে।

এই সকল ব্যাক্তিগত প্রত্যাশা পূরণের জন্য সবসময় যে সরকারের অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিকেই এই ধরণের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয়।

আমাদের এমপিরা তাদের বেতন ভাতা দিয়ে সংসার চালানোর পরও এই ধরণের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে পারেন কিনা, তা তারাই ভালো বলতে পারবেন। অনেকের ক্ষেত্রে এই ধরণের খরচ সামলানো সম্ভব হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নাও হতে পারে।

এই কারণে বিগত সরকারগুলোর ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি কেনার সুবিধাকে অনেকেই আয় বাড়ানোর উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের নামে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানী করে তারা তা বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এতে ব্যবসায়ীরা যেমন পেয়েছেন বাজার মূল্যের চেয়ে কমদামে আধুনিক গাড়ি, তেমনি এমপিরাও বাড়তি আয় নিশ্চিত করেছেন ।

(২) প্রচারণা

নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য একজন প্রার্থীকে প্রচার এবং প্রচারণা খাতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। প্রচার যত বাড়বে, প্রার্থীকে তত বেশি ভোটার চিনবে। আবার প্রতিটি ভোটারের মন মানসিকতাও ভিন্ন। একজন ভোটার একটি বিষয় পছন্দ করলে অন্য এক ভোটারের কাছে এই বিষয়টি পছন্দনীয় না-ও হতে পারে। তাই এখনকার নির্বাচনগুলিতে প্রতিটি ভোটারকে আকৃষ্ট করার জন্য একজন প্রার্থী বিভিন্ন রকমের কৌশলের আশ্রয় নেন। এর অনেক কৌশল ইতিবাচক, আবার অনেক কৌশল নেতিবাচক। এই সকল কৌশলগুলি নেয়া হয় ভোটারদের বিভিন্ন দুর্বলতাকে মাথায় রেখে। যেমন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ভোটারেরই নীচের দুর্বলতাগুলি রয়েছেঃ

১. ভোটার চমক পছন্দ করে।
২. ভোটার প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়।
৩. বিপক্ষ দলের প্রার্থীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে ভোটার তা পছন্দ করে।
৪. একটি মিথ্যাকে বার বার বলতে থাকলে ভোটার তা একসময় বিশ্বাস করা শুরু করে।
৫. প্রার্থীর বাগ্মীতা ভোটারকে আকৃষ্ট করে। একজন প্রার্থী অযোগ্য হলেও তার যদি চটকদার বক্তব্য দেয়ার সামর্থ থাকে, তাহলে ভোটার তাকে ভোট দিতে আকৃষ্ট হয়।
৬. ভোটার অনেক সময় শুধুমাএ মার্কা দেখে ভোট দেয়।

এই দুর্বলতাগুলি পৃথিবীর সকল শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভোটারের ক্ষেএেই সত্য।

যেমন কোন একটি নির্বাচনে যদি একজন ফিল্ম স্টার জয়লাভের জন্য দাঁড়ান, ভোটার তখন তার আইন প্রণয়নের যোগ্যতার চেয়ে তার অন্যান্য ক্যারিশমাকেই সাধারণত প্রাধান্য দেয়। এই ধরণের ধারা দেখা গেছে হলিউড এবং বলিউডের নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে যারা অতীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

আবার প্রার্থীর যোগ্যতার আসলে কোন সঠিক সংজ্ঞা নেই। একজন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হওয়া উচিত তখনই যখন তার নের্তৃত্বে তার আশেপাশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত হবে, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবেন এবং তার এলাকাকে একটি মডেল এলাকায় রূপান্ত রিত করবেন।

কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একজন প্রার্থী হয়তো তার এলাকায় খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু হয়তো উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি ততোটা দক্ষ নন। কিন্তু তারপরও তিনি বছরের পর বছর নির্বাচনে জয়লাভ করছেন। অন্য কোন প্রার্থী তাকে হারাতে পারছে না। এক্ষেত্রে

প্রার্থীর দক্ষতার চেয়ে তার আবেগতাড়িত বক্তব্য দেয়ার ক্ষমতা, মানুষের সাথে সহজে মেশার দক্ষতা, মিষ্টি কথা বলার পারদর্শীতা, ইত্যাদি ফ্যাক্টরগুলো মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধরণের প্রবণতার অন্যতম কারণ হল ভোটার প্রার্থীর যোগ্যতার চেয়ে অনেক সময় তার অন্যান্য ক্যারিশমাকে প্রাধান্য দেয়। এই ক্যারিশমাগুলোর প্রভাব বেড়ে যায় যদি প্রার্থী প্রচারণা কৌশলে ব্যাপক বিনিয়োগ করেন।

প্রচারণায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তথ্যের অসামঞ্জস্যও একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক পরিভাষায় একে বলে ইনফরমেশন এসিমেট্রি (Information Assymmetry)। একটি দলের প্রার্থী কখনই জানেন না তার বিপক্ষ দলের প্রার্থীটি কত টাকা নিয়ে প্রচারণা যুদ্ধে নামছেন। তাই অন্য প্রার্থী নিশ্চয়ই অনেক খরচ করবে, এই আশঙ্কা থেকে প্রত্যেকেই চান তার প্রচারণাতে যেন কোন গলদ না থাকে।

তাই এ ধরণের চমক সৃষ্টি করার জন্য এবং ভোটারকে প্রচারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য নির্বাচনে প্রতিটি প্রার্থীকে অঢেল টাকা নিয়ে নামতে হয়।

এই কারণেই প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির সবচেয়ে বড় পছন্দ সেই সকল প্রার্থীদেরকে যাদের টাকার কোন টান নেই। এদের মধ্যে অনেকের আবার আইন প্রণেতা হবার সঠিক যোগ্যতা আছে, আবার অনেকেরই নেই।

ফলে এই প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়ছেন সৎ, যোগ্য এবং সাধারণ প্রার্থীরা যাদের অঢেল টাকা নেই। তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদেরকেও নামতে হচ্ছে টাকা কামানোর খেলায়।

এই ধরণের সৎ প্রার্থীরা একবার যদি নির্বাচিত হয়ে যান, তাহলে দ্বিতীয়বার তার সাফল্য ধরে রাখার জন্য তাদেরকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এই কারণে সাম্প্রতিককালে অনেকের নামেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে যাদের উপর আগে এই ধরণের কোন অভিযোগ ছিল না।

সমস্যার গভীরে

প্রচারণার জন্য দুর্নীতির প্রয়োজনের গভীরে গেলে দেখা যাবে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের এই ধরণের দুর্নীতির প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে একাধিক কারণে।

প্রথমত, বাংলাদেশ একটি অধিক জনবহুল দেশ হওয়ার কারণে এর প্রতিটি সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা অত্যধিক। বাংলাদেশের একটি জেলার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক উন্নত দেশের মোট জনসংখ্যার সমান।

ফলে যে কোন নির্বাচনে প্রতিটি ভোটারের মন জয় করার জন্য বাংলাদেশের একজন প্রার্থীকে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি খরচ করতে হয়।

এই ধরণের খরচের প্রয়োজন ক্রমান্বয়েই বাড়ছে কারণ ভোটার শিক্ষিত হচ্ছে। স্মার্ট হচ্ছে। তাই আজকের ভোটারের মন জয় করা এতোটা সহজ কাজ নয়।

ফলে আগে একটি মাএ জনসমাবেশ করে, মাইকিং করে কিংবা পোস্টার ছেপে যে কাজটি করা যেত, সেখানে এখন প্রয়োজন হচ্ছে কোটি কোটি টাকার টিভির বিজ্ঞাপন, বাহারী বিলবোর্ড এবং আধুনিক টিভি চ্যানেল। দুর্নীতির প্রয়োজনও সেইসাথে বাড়ছে হু হু করে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পরও আমরা একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এই দেশে ক্ষমতাহীনদের উপর ক্ষমতাধরদের অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই ক্ষমতাহীনরা প্রতিনিয়ত শোষিত হওয়াতে তাদের মনে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতাধর হওয়ার বাসনা জাগছে। আর এই বাসনা পূরণের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হয়ে উঠছে রাজনীতি। কারণ ক্ষমতাধর হতে হলে প্রয়োজন টাকার, এই বিশ্বাসটি এখন সকলের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। আর রাজনীতি করলে ক্ষমতা আসে, যার অপব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যায় সহজ টাকা।

ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি দিন দিন হয়ে উঠছে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাধর হওয়ার বাসনা পূরণের ক্ষেত্র। তাই আমাদের যারা নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদ হচ্ছেন, তাদের মূল লক্ষ্যই থাকছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিভাবে সহজে টাকা বানানো যায়।

তাই এই ধরণের ব্যক্তিরা একবার ক্ষমতাধর হয়ে গেলে তাদের প্রয়োজন পড়ছে সেই ক্ষমতা ধরে রাখার। কারণ তারা কেউই চাননা আগের মতো ক্ষমতাহীন হয়ে আবারো নির্যাতিত হতে। তাই এই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য প্রচারণার গুরুত্বও দিন দিন বাড়ছে।

তৃতীয়ত, ক্ষমতা ধরে রাখার প্রয়োজনে প্রচারণার প্রভাবটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব এই প্রচারণা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসকেও উৎসাহিত করছে। প্রার্থীদের প্রচারণার জন্য অনেক লোকবলের প্রয়োজন হয়। তাই নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা নির্ভর করেন সেই সকল কর্মীদের উপর যারা দিন রাত তার হয়ে পরিশ্রম করতে পারবে। এই কর্মীরা কেউই

ক্লাশের ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয় নন। এদের অধিকাংশই হল সমাজের বেকার যুবক যাদের কোন প্রকার কর্মসংস্থান নেই।

এই কারণে ক্ষমতাধর প্রাথীদের কাছে ক্লাশের ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয়দের চেয়ে এই ধরণের বেকার কর্মীদের মুল্য অনেক বেশি। এই ধরণের প্রাথীরা যখন নির্বাচিত হয়ে যান, তখন সময় আসে কর্মীদেরকে প্রতিদান দেয়ার। তাই এই ধরণের কর্মীরা যদি অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন এই প্রাথীরাই তাদেরকে বিচারের হাত থেকে বাঁচান। ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে সফল হয় না। ন্যায়বিচার হীনতার এই অশুভ চক্র দিন দিন চলতেই থাকে। ফলে বাড়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা

আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন বাংলাদেশে বিগত বিএনপি নের্তৃত্বধীন জোট সরকারের আমলে একের পর এক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল স্থাপিত হয়েছে। এর প্রতিটির পিছনেই রয়েছেন বিগত সরকারের কাছের ব্যক্তিরা। বিগত সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা ইতিমধ্যেই অনুধাবন করেছেন আগামীতে নির্বাচনগুলিতে জয়লাভ নিশ্চিত করতে হলে এই আকাশ সংস্কৃতিতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়েছে। ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা ইতিমধ্যেই নতুন টিভি চ্যানেল স্থাপন করেছেন। কারণ তারাও চান আগামীতে আকাশ সংস্কৃতিকে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। দেশে যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ কোন না কোনভাবে এই সকল বিএনপি প্রভাবাধীন মিডিয়া হাউসগুলিকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করবেন। তাই এই ধরণের বিএনপি চ্যানেল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এমনটি সত্যি সত্যি ঘটলে দর্শকরা যেমন তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন, তেমনি সাময়িকভাবে অসুবিধায় পড়বেন এর কলাকুশলীরা।

তবে এর উল্টোটাও হতে পারে। এই বিএনপি চ্যানেলগুলিকে চলতে দিয়ে আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ টাকা আয় করে আরো নতুন চ্যানেল স্থাপন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই দুটি বড় দলের মধ্যে একটি গোপন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অনেকটা "তুই না কইলে আমিও কমু না" ধরণের।

ফলে দর্শকরা জলাবদ্ধতা, পানি সঙ্কট ইত্যাদি সাধারণ সমস্যার কথা ঠিকমতোই জানতে পারবেন। কিন্তু চ্যানেলগুলি চেপে যাবে বৃহৎ দুর্নীতিগুলোর খবর। ফলে দেশে দুর্নীতি

আরো পরিশীলিত হবে, মডার্ন হবে। দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসবে, কিন্তু তা হবে একপেশে। এর ফলে বাড়বে অসমতা।

বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দরিদ্র ছোট দেশে ব্যাপক অসমতা রীতিমত ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। আপনি মার্সেডিজ গাড়ি চালাচ্ছেন, অথচ আপনার পাশের এলাকার এক বিরাট জনগোষ্ঠী না খেয়ে আছে, এই ধরণের পরিস্থিতি বেশি দিন চলতে দিলে সমাজে অস্থিরতা বাড়বে।

সমাধানের খোঁজে

প্রথম সমস্যাটির সমাধান খুব সহজ।

ভোটারদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা পূরণের মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতা এমপিদেরকে দিতে হবে। আমাদের দেশে এমপিদের বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নিলেই সর্বএই আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সবাই ব্যাপারটি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, মজা করেন। বলেন, দেশে মানুষের পেটে ভাত নেই অথচ এমপিরা বেতন বাড়াচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হল বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে এমপিদের বেতন অনেক বেশি থাকা উচিত। না হলে তারা স্বাভাবিকভাবেই ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি এনে ব্যবসা করবেন, গম চুরি করবেন, দিঘী খোদাই করার কথা বলে পুকুর খোদাই করবেন।

দ্বিতীয় সমস্যাটি অনেক জটিল। এর সমাধান খুব সহজ নয়। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন গণতান্ত্রিক দেশ নেই যারা প্রচারণার কোন বিকল্প বের করেছে।

যেহেতু জার্মানীর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দীর্ঘদিন দুর্নীতি নিয়ে গবেষণা করছে, সেহেতু রাজনৈতিক দুর্নীতির এই সমস্যাটির ব্যাপারে তাই প্রথমেই দেখা যাক তারা এর কোন সমাধান দিতে পারে কিনা।

(১) টিআই এর প্রস্তাব

টিআই প্রতি বছরই একটি গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২০০৪ সালের এই ধরণের রিপোর্টটির মুল থিম ছিল রাজনৈতিক দুর্নীতি। রিপোর্টটিতে রাজনৈতিক দুর্নীতি কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। মুল প্রস্তাবগুলি হলঃ

১. রাজনৈতিক দলগুলি টাকা কোথা থেকে পায় তা জানার জন্য সরকারকে আইন করতে হবে।
২. সরকারকে এমন আইন করতে হবে যাতে কোন নির্বাচিত ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. মিডিয়াতে সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. নির্বাচনের আগে এবং পরে প্রার্থীকে তার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করতে হবে।
৫. ঋণ দেয়ার সময় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের রাজনৈতিক দুর্নীতির বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রস্তাবগুলি বাস্তবসম্মত সন্দেহ নেই। এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়ন করা গেলে রাজনৈতিক দুর্নীতি অনেকাংশেই কমে আসবে, এই আশা করা যায়।

কিন্তু সচেতন পাঠকেরা খেয়াল করলে দেখবেন এই প্রস্তাবগুলিতে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন আইন করার মাধ্যমে। এর উৎপাওস্থলকে প্রভাবিত করে নয়।

এর মানে এই প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে দুর্নীতির প্রয়োজন কমানোর কোন পথ বাতলে দেয়া হয়নি। যেমন প্রচারণা চালানোর অতিরিক্ত টাকা কোথা থেকে আসবে, সেই ব্যাপারে টিআই কোন সমাধান প্রস্তাব করেনি। তাই প্রচারণার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতির প্রয়োজন যতদিন থাকবে, ততদিন তারা দুর্নীতিকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে যাবে।

ফলে তাদের দুর্নীতি দমনের ইচ্ছা কাগজে কলমে থাকবে, কিন্তু বাস্তবে থাকবে না। তাই দুর্নীতির প্রয়োজনকে না কমিয়ে কোন আইন করা হলে এই আইনের বাস্তব প্রয়োগ হবে খুব কম।

(২) তত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বিগত তত্বাবধায়ক সরকার প্রচারণা খাতে টাকা খরচ কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রচারণার সময়কাল কমিয়ে দেয়া, প্রচারণার ধরনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার চেয়ে বেশি টাকা প্রচারণা খাতে ব্যয় করার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা, ইত্যাদি।

বিগত সরকারের এই ধরণের পদক্ষেপের সুফল বিগত নির্বাচনে দেখা গেছে এটা সত্যি। কিন্তু এই ধারা কতদিন চালু রাখা যাবে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। যেমন, বিগত নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে দীর্ঘ দিন দেশে জরুরী অবস্থা জারি ছিল। তাই সকলের মধ্যেই এক

ধরণের ভীতি কাজ করছিল। এই ভীতির কারণে অনেকেই নিয়ম ভঙ্গ করতে উৎসাহী হননি। কিন্তু একই ভীতি আগামীতে বজায় থাকবে কিনা, তা কেউই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবেন না।

বিগত নির্বাচনে মিডিয়ার একাধিক রিপোর্টে দেখা গেছে বিভিন্ন প্রার্থী নিয়ম ভঙ্গ করছেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে এই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ না আসাতে কমিশন প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর কারণ তত্বাবধায়ক সরকার প্রচারণার প্রয়োজনের উৎসকে প্রভাবিত না করে বরং আইন করে এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হল নির্বাচন জয়ে প্রচারণার গুরুত্ব যতদিন থাকবে, প্রার্থীরাও ততদিন কোন না কোনভাবে আইনের ফাঁক গলে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে বিরুদ্ধ প্রার্থীরা কোন অভিযোগ দায়ের করবেন না, বরং তারাও শামিল হবেন এই প্রচারণা যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে। কারণ তারাও নির্বাচনে জিততে চান।

(৩) আওয়ামী লীগের প্রস্তাব

২০০৫ সালের শেষের দিকে সাবেক বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তৎকালীন সংসদে তত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রস্তাব সংসদে পেশ করেছিল। এই সকল সংস্কার প্রস্তাবের কয়েকটি আবার রাজনৈতিক দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত।

তাদের প্রস্তাবগুলি হলঃ (১) প্রার্থীর আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা, (২) কালোটাকার মালিক এবং ঋণখেলাপীদের প্রার্থী হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করা, এবং (৩) নির্বাচনী ব্যয় তদারকি করা।

একইভাবে বলা যায় আওয়ামী লীগের এই প্রস্তাবগুলিও ভালো কিন্তু এগুলিও একই দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ এখানে দুর্নীতির প্রয়োজনকে না কমিয়ে আইন করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটি সম্ভাব্য সমাধান

তবে আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ সেসময় তাদের প্রথম সংস্কার প্রস্তাবে একটি দাবী করেছিলেন যা এই সমস্যার সমাধান করলেও করতে পারে। খুব সম্ভবত তারা তখন ভেবেছিলেন প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত নয়। তাই পরবর্তীতে সংসদে তারা এই দাবীটি আর

তুলেননি। তবে তারা এই দাবীটি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের সাথে অনুষ্ঠিত প্রাক সংলাপে।

তাদের দাবী ছিল নির্বাচনে প্রচারণার ভারটি একটি তৃতীয় পক্ষের কাছে দিয়ে দেয়া হোক। এক্ষেত্রে তারা বলেছিলেন নির্বাচন কমিশনের কথা। এই দাবীটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা পরবতীতে দৈনিক যুগান্তরে একটি আর্টিকেলও লিখেছিলেন। আর্টিকেলটির শিরোনাম "প্লীজ, সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলুন"।

এই আর্টিকেলটির ২য় পৃষ্ঠায় ১৯৭১ পরবতী স্বাধীন বাংলাদেশের একটি নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, *"…. নির্বাচনে যাতে কালো টাকা ও সন্ত্রাসীরা প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তাহলো, প্রার্থী যারা হবে তাদের পোস্টার সরকার করে দেবে। নির্বাচনের সব খরচ জাতীয় সরকার বহন করবে। প্রার্থী শুধু বাড়ী বাড়ী যেতে পারবে। সভা-সমাবেশ এক সাথে করতে পারবে। একই মঞ্চে দাঁড়াবে। এজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে নিরপেক্ষভাবে। এভাবে দুটো উপনির্বাচন হয়। কিশোরগঞ্জে উপনির্বাচনে একজন স্কুল শিক্ষক জয়ী হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাই হেরে যান। ক্ষমতায় ছিলেন বলে ভাইকে জেতাতে কারচুপিও করেননি, ক্ষমতার প্রভাবও খাটাননি।"*

এই আর্টিকেলটি আপলোড করা আছে আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইটে। আগ্রহীরা এই আর্টিকেলটি পড়ে দেখতে পারেন।

আমার মতে, আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দের এই দাবীটি খুবই যুক্তিসঙ্গাত এবং আধুনিক। এ ধরণের একটি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রয়োজনের দুর্নীতি অনেকাংশেই কমে যাবে বলে আশা করা যায়। তাই বাকি থাকবে শুধু লোভের দুর্নীতি।

এখন আলোচনা করা যাক কিভাবে এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা যায় এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কি কি হতে পারে।

বাস্তবায়নের কৌশল

নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রচারণার দায়িত্ব ন্যস্ত হলে নির্বাচন কমিশনের প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন পড়বে। তবে এই সমস্যাকে কাটানো যায় যদি আগামী তত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে স্থানীয় প্রশাসনকেও এই প্রচারণার কাজে যুক্ত করা যায়।

ফলে তত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রশাসনের রুটিন কাজের পাশাপাশি আরেকটি কাজও বাড়বে। সেটি হল নির্বাচনী প্রচারণা।

এই প্রচারণা কেমন হবে, কতটুকু হবে, কোথায় কয়টি পোস্টার লাগবে, তার কি ভাষা হবে, ইত্যাদি বিষয়গুলি ঠিক করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি আলোচনা করে একটি প্রচারণার গাইডলাইন তৈরী করতে পারে।

এই গাইডলাইনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে, মিডিয়াতে কে কয়টি কত সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারবে, কয়টি পোস্টার ছাড়া হবে, কোথায় কোথায় লাগানো হবে, ইত্যাদি।

ফলে রাজনৈতিক দলগুলি আগেভাগেই তাদের প্রার্থী ঠিক করে রাখবে। তিনি তার স্বাভাবিক প্রচারণা চালাবেন তত্বাবধায়ক সরকার আসার আগ পর্যন্ত। তবে তত্বাবধায়ক সরকার আসার পর তাকে সব প্রচারণা বন্ধ করে দিতে হবে। তখন প্রচারণার দায়িত্ব নিবে সরকার। এই তিনমাস প্রচারণা হবে আগে ঠিক করা ফরম্যাটে এবং সকলকে সমান সুযোগ দিয়ে।

তবে এক্ষেত্রে প্রচারণার সংজ্ঞা ঠিক করতে হবে সবার আগে। এই সংজ্ঞা এতোটা ব্যাপক যে অনেক সময় দেশের বাইরের ঘটনাও ভোটারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সংজ্ঞাটি ঠিক করা না হলে নির্বাচনের আগে যদি কোন প্রার্থী মেয়ের বিয়ের উসিলায় গ্রামসুদ্ধ লোক খাওয়ানো শুরু করেন, তাহলে গন্ডগোল বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রস্তাবটির প্রভাব

এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে এর প্রভাব সুদুরপ্রসারী হবে বলে আশা করা যায়। এখন দেখা যাক এর মাধ্যমে কি কি প্রভাব পড়তে পারে।

১. প্রথমেই প্রার্থীর টাকা আছে কি নেই, এই ব্যাপারটি আর তখন মুখ্য থাকবে না। তখন মুখ্য থাকবে প্রার্থীর কোয়ালিটি এবং জনপ্রিয়তা।

ফলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলি মনোনয়নের জন্য ঝুকবে সেই কৃষকটির দিকে যিনি নতুন বীজ আবিস্কার করে সারা গ্রামের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। কিংবা দলগুলি টেনে আনবে সেই প্রধান শিক্ষককে যার হাতের ছোঁয়ায় এক ঝাক ছাএ-ছাএী জিপিএ ফাইভ পেয়ে গ্রামে হুলস্থুল কান্ড বাধিয়ে দিয়েছে।

এই ধারা চলতে থাকলে অচিরেই আমাদের সংসদ ভরে উঠবে দেশের সেরা মানুষদের দিয়ে।

২. রাজনৈতিক দলগুলি তখন কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দেবে বলে কর্মীদের মধ্যে কোয়ালিটি দিয়ে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। ফলে সারা দেশে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে।

৩. নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তখন আর প্রচারণা চালানোর টাকা উঠানোর জন্য চেষ্টা করবেন না। যেহেতু ভোটারদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা মেটানোর মতো বেতন তাদেরকে দেয়া হবে, তাই তাদের দুর্নীতির প্রয়োজন থাকবে না। তখন তাদের একমাএ লক্ষ্যই থাকবে তার নিজের এলাকার তথা দেশের উন্নয়ন।

৪. ছাএ রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। বর্তমানে ভবিষ্যতে নেতা হওয়ার লক্ষ্যে ছাএনেতারা ছাএজীবনেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু তখন তাদের এই দুর্নীতির প্রয়োজন কমে আসবে। ফলে তারা মন দিবেন পড়াশুনা করে নিজের মান বাড়ানোর দিকে।

৫. গণমাধ্যমে এর প্রভাব হবে সুদুরপ্রসারী। বর্তমানে নির্বাচনী প্রচারে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তখন প্রচারণার যেহেতু একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকবে, তাই সাংবাদিকদের খুশি রাখার প্রতি রাজনীতিবিদরা আগ্রহ হারাবেন। ফলে সৎ সাংবাদিকতার একটি তাগিদ সৃষ্টি হবে সকলের মধ্যে।

৬. সকলেই হবেন উন্নয়নমুখী। অগণতান্ত্রিক আচরণ করে জনপ্রিয়তা হারানোর কথা কেউ কল্পনাও করবেন না। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। ফলে শক্তিশালী হবে দেশের গণতন্ত্র।

তবে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহ কমে যেতে পারে। বর্তমানে নির্বাচনের সময় অবাধ টাকার প্রবাহের কারণে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনকে

ঘিরে এক ধরণের উন্মাদনা দেখা যায়। কিন্তু নতুন প্রস্তাবে যেহেতু টাকার খেলা বন্ধ হয়ে যাবে, সেহেতু ভোটারের সেই উন্মাদনা আর থাকবে না।

ফলে নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কমে যেতে পারে। তবে এতে একটি লাভ হবে। ভোট দিতে তখন শুধুমাত্র সচেতন ভোটররাই আসবেন। অবিবেচক ভোটাররা আর আসবেন না। ফলে আমরা পাব অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্ত।

এখানে একটি প্রশ্ন হল এই ব্যবস্থাটি ১৯৭১ এর পর নেয়া হলেও পরবর্তীতে বলবত থাকেনি কেন? কিংবা সেই দুটি উপনির্বাচন হওয়ার পর আর কোন নির্বাচন কি একই ব্যবস্থাতে হয়েছিল? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন হয়নি? এটা কি ব্যবস্থাটির কোন দুর্বলতার কারণে, নাকি অন্য কারণে?

এই কারণগুলি আমার জানা নেই। তবে আমার মতে, এই ব্যবস্থার দুর্বলতা যাই থাকুক, আমরা যদি তাত্ত্বিক দিক থেকে সকলে এই ব্যবস্থার পক্ষে একমত হতে পারি, তাহলে দুর্বলতাগুলো একে একে চিহ্নিত করে তা দুর করা যাবে।

প্রস্তাবটির পরীক্ষা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ব্যবস্থাটিতে কোন প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন আনতে হবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যায় আগামী স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলিতে কিংবা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে। এর জন্য তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না।

পরীক্ষা সফল হলে আগামীতে সরকারি কিংবা বিরোধী দল এই প্রস্তাবটি বিল আকারে সংসদে তুলতে পারে। আগামী স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলিতে এই পরীক্ষাটি যদি সফল হয়, এরপর সকলেই যদি এতে সম্মতি দেন এবং জনমত যদি এর পক্ষে থাকে, তাহলে আগামী জাতীয় নির্বাচনটি হতে পারে এই নতুন ফরম্যাটে।

আগামী জাতীয় নির্বাচন যদি এই নতুন ফরম্যাটে হয় এবং তা যদি গ্রহণযোগ্যতা পায়, তাহলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চার ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এর সাথে ইতিহাসে ঢুকে যাবেন সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদরাও।

লোভের দুর্নীতি

এম এম মডেল অনুযায়ী রাজনীতিবিদদের লোভের দুর্নীতি কমাতে হলে তাদের বেতন ভাতা হতে হবে তাদের ক্ষমতার সমান। যেহেতু র‍্যাব এবং পুলিশ তাদের কথাতেই উঠে-বসে, তাই রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা দেশে সবচেয়ে বেশি। তাই তাদের বেতনও হতে হবে অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি।

এর পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতার কাঠামোও সবচেয়ে কঠোর হতে হবে।

তবে একথা খেয়াল রাখা দরকার রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন অন্যান্য রাজনীতিবিদরাই যারা একে অপরের বেয়াই, বাবা, বন্ধু বা আত্মীয়। ফলে কাজীর গরু কাগজেই থাকবে, তার গোয়ালে আসার সম্ভাবনা কম। তাই রাজনীতিবিদদের লোভের দুর্নীতি কমানোর জন্য নৈতিকতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

২.১ দুর্নীতির মাত্রা
২.২ সূচকের বাইরের দুর্নীতি
২.৩ একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

২.১. দুর্নীতির মাত্রা

কোন দুর্নীতি বেশি দুর্নীতি এবং কোন দুর্নীতি কম দুর্নীতি, এই বিষয়টি নিয়ে নানাজন নানা মত দিতে পারেন। তবে সাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে, যে দুর্নীতির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি টাকার লেনদেন করা হয়, সেই দুর্নীতিই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। অর্থাৎ, এখানে দুর্নীতির মাত্রার নিয়ামক হল টাকার লেনদেনের পরিমাণ।

কিন্তু আমার এই বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

আমি মনে করি, একটি দুর্নীতির মাত্রা কেমন, তা নির্ণয় করার জন্য প্রথমেই দেখতে হবে দুর্নীতিটি কিভাবে করা হয়েছে। এখানে টাকার লেনদেনের পরিমাণ কত তা দুর্নীতি মাত্রা নির্ধারণের মূল নিয়ামক নয়।

আমার এই মতের সাথে অনেকেই অমত করতে পারেন, তবে আমি আমার মতের স্বপক্ষে নীচের চারটি সম্ভাব্য দুর্নীতির উদাহরণ দিচ্ছি। এই উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিই কাল্পনিক। এই উদাহরণগুলিতে যে সকল চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তার সাথে বাস্তব কোন চরিত্রের মিল নেই।

এই ঘটনাগুলির প্রতিটি কাল্পনিক হলেও এই ধরণের দুর্নীতি অহরহ ঘটছে আমাদের চারপাশে। পাঠকরা এই কাল্পনিক উদাহরণগুলির মাধ্যমে জানতে পারবেন দুর্নীতির ব্যাপকতা শুধুমাত্র ঘুষের লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দুর্নীতির ক্ষেত্র আরো অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপক।

সেই সাথে পাঠকরা এটাও বুঝতে পারবেন, দুর্নীতি হওয়ার জন্য আসলে সরাসরি টাকার লেনদেন হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং টাকার লেনদেন ছাড়াও অনেক বড় বড় দুর্নীতি হতে পারে। টাকার সরাসরি লেনদেন হয়না বলে এই ধরণের অনেক বড় দুর্নীতি কোন প্রকার সূচকে প্রতিফলিত হয় না। তাই সূচকের আওতার ভিতর এবং বাইরের এই সকল দুর্নীতির স্বরূপ বুঝতে হলে প্রতিটি ঘটনাই মন দিয়ে পড়ুন এবং আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, কোন দুর্নীতি বড় দুর্নীতি তা নির্ধারণে টাকার পরিমাণের কোন প্রকার মুখ্য ভূমিকা আদৌ আছে কিনা।

কাল্পনিক ঘটনা ১
সান্টু ভাইয়ের জমি দখল

“সব ঠিক আসে, মুন্না?”

“হ বস, সব ঠিক আসে। কোন চিন্তা কইরেন না।”

“দেখিস, কেউ যাতে টের না পায়।”

“না বস। কেউ টের পাইব না। এমনভাবে করুম, কাকপক্ষীও জানবো না।

“আচ্ছা ঠিক আসে।”

“কিন্তু বস, আমাগো খেলা দেখার কি হইবো?”

“আরে ওইটা নিয়া চিন্তা করিস না। ভিডিও কইরা রাখুম নে। আমার বাসায় আইসা দেখবি।”

“ঠিক আসে, বস রাখি।”

মুন্না ফোনটা রেখে দেয়াতে নিজেরটাও অফ করে দিলেন মি. বেলায়েত হোসেন সান্টু।

পাড়া মহল্লায় মি. বেলায়েত হোসেনকে সবাই ‘সান্টু ভাই’ নামে চেনে। তিনি সরকারি দলের রাজনীতি করেন আজ অনেক বছর হল। রাজনীতি শুরু করেছিলেন একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিরোধী দলের সাথে একাধিক মোকাবেলায় নিজের সাহসিকতা দেখিয়ে নজর কাড়েন উপরের সারির নেতাদের। এরপর ধীরে ধীরে হয়ে যান এলাকার পূর্বতন এমপি কাশেম সওদাগরের ডানহাত।

কাশেম সওদাগর ছিলেন তার দলের অন্যতম নীতিনির্ধারকদের একজন। তিনি মারা যাওয়ার পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় তার বিদেশ পড়ুয়া ব্যারিস্টার ছেলে মি. শহিদ। আগ থেকেই তার রাজনীতির সাথে কিছুটা যোগাযোগ ছিল। তাই পরে বাবার কানেকশন কাজে লাগিয়ে মি. শহিদকে উপরে উঠতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। তাই এমন এক

উপরের সারির নেতার সমর্থন এবং বদান্যতায় বেলায়েত হোসেন সান্টু এখন এলাকার প্রভাবশালী নেতা।

মি. সান্টু ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন তাকে যদি আরো উপরে উঠতে হয়, তাহলে তার প্রয়োজন টাকা। কাড়িকাড়ি টাকা। কারণ টাকা ছাড়া সমাজে যেমন কারো দাম নেই, তেমনি যার টাকা নেই, তাকে কেউ ভয়ও করে না। টাকা যদি না থাকে তাহলে কর্মীদেরকেও বেশীদিন হাতে রাখা যায় না। কারণ তারাও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে টাকা বানানোর জন্য। তাই মি. সান্টুকে যদি নিজের প্রভাব ধরে রাখতে হয়, এবং ধীরে ধীরে মি. শহিদের স্থলাভিষিক্ত হতে হয়, তাহলে টাকা কামানো ছাড়া তার সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই।

তাই মি. সান্টুর নজর এখন তার এলাকার কিছুটা বাইরে একটি বস্তির দিকে। বস্তিটা গড়ে উঠেছে মূলত সরকারি খাস জমির উপর। তবে এর মধ্যে কিছু জমি রয়েছে এক বৃদ্ধার, এবং কিছু জমি রয়েছে মি. খালেকের। এই পুরো জমির বাজার মূল্য হবে প্রায় ২০ কোটি টাকা। তবে গুজব রয়েছে আগামীতে নাকি এই জমির কাছ দিয়েই রাজউকের একটি বড় রাস্তা হওয়ার কথা আছে। গুজবটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে রাস্তা হওয়া মাএই এই জমির মূল্য রাতারাতি কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

মৃত মি. খালেকের উওরাধিকার সুত্রে এই জমির মালিক হয়েছে তার তিন ছেলে। তবে তিন ছেলের মধ্যে কোন মিলমিশ নেই। এই জমি নিয়ে এবং বস্তির ভাড়ার টাকা নিয়ে তাদের বিরোধ এখন চরমে।

মি. সান্টু ইতিমধ্যেই মি. খালেকের এক ছেলের সাথে ভাব জমিয়েছেন। ছেলেটির নাম রুস্তম। তিনি রুস্তমকে কথা দিয়েছেন এই পুরো বস্তির নিয়ন্ত্রণ তাকে এনে দেবেন। তবে এর জন্য মি. সান্টুর পরিকল্পনাতে রুস্তমকে সায় দিতে হবে।

রুস্তম এই লোভনীয় প্রস্তাবে অমত করেনি।

তাই মি. সান্টু পরিকল্পনা সাজিয়েছেন কিভাবে কি করতে হবে। প্রথমদিকে রুস্তমকে কাজে লাগানো হলেও পরবর্তীতে তাকেও সরিয়ে দেয়া হবে। তাই মি সান্টু তার প্রাথমিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন তার নির্ভরযোগ্য ‘কাবাব’ মুন্নার উপর।

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পুরো বস্তিটি রাতের আধারে পুড়িয়ে দিতে হবে। কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে এই বিষয়টি নিয়ে কোন হই চই না হয়। তাই মি. সান্টু ঠিক

করেছেন যখন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে, ঠিক তখন রাতের বেলা কাবাব মুন্না তার গুটিকয়েক সাগরেদ নিয়ে বস্তির চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিবে।

এই সময়টা মি. সান্টু অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন। প্রথমত, বিশ্বকাপ নিয়ে এমনিতেই সারা দেশ ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। তার মধ্যে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার উত্তেজনাকর খেলাটি যে রাতে হবে, তার পর দিন স্বাভাবিকভাবেই সকল পত্রিকা জুড়েই থাকবে খেলাটির খবর। তাই কারোর নজরেই পড়বে না ঢাকার উপকণ্ঠে একটি বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনাটি। আর কারো নজরে যদি না পড়ে, তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। আর সেই সাথে রুস্তম যেহেতু তার সাথে আছে, সেহেতু ভিতর থেকেও চাইলে সাহায্য পাওয়া যাবে। আর পরিস্থিতি যদি আদৌ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে শহিদ ভাই তো আছেনই।

তাই পরিকল্পনাটিতে আসলে কোন প্রকার খুঁত নেই, এই ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত মি. বেলায়েত হোসেন ওরফে সান্টু ভাই।

* * *

মি. সান্টু তার লিভিং রুমে বসে আছেন।

তার হাত ঘামছে। তিনি যখন কোন কিছু নিয়ে টেনশন করেন, তখন তার হাত ঘামে।

কিছুক্ষণ আগে মুন্না খবর দিয়েছে সব ঠিক আছে।

রাত প্রায় বারোটা। বস্তির পুরুষ, মহিলা, এবং বাচ্চাদের একটি বিরাট দল জড়ো হয়েছে বস্তির দুটো ঘরে যেখানে টিভি রয়েছে। তারা সবাই খেলা দেখায় মত্ত। অনেকে উল্লাস প্রকাশ করছে, অনেকে চুপচাপ খেলা দেখছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে এল, *আগুন, আগুন।*

চিৎকার শুনে সবাই বাইরে এসে হতবাক। চারিদিকে আগুন। এই আগুন হঠাৎ কোথা থেকে আসল কেউ জানে না। আগুন দেখে সবাই দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করা শুরু করল। অনেকে ছুটে গেল পানি আনতে। মহিলাদের অনেকে হায় হায় করতে লাগল। অনেকে

বলল তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেডে খবর দাও। কিন্তু কে খবর দিবে, কিভাবে খবর দিবে, কেউ জানে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বস্তির সর্বএ আগুন ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের ছোটাছোটি, মহিলা এবং বাচ্চাদের কান্না, এবং গরম আগুনের হলকা সবকিছু মিলিয়ে মনে হল বস্তিটিতে যেন কেয়ামত নাজিল হয়েছে।

আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক মহিলা উচ্চস্বরে বিলাপ করছেন, আর হাত দিয়ে মাথা চাপড়াচ্ছেন। খেলা দেখার জন্য তিনি তার দুটি বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলেন তার ঘরে। আগুন লাগাতে পুরো ঘরটা ইতিমধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাচ্চা দুটির বেঁচে থাকার আর তাই কোন সম্ভাবনাই নেই।

দুর থেকে সবকিছু দেখছে মুন্না।

“কাজটা ভালোমতোই হইছে। কি কস, সেলিম?”, সেলিমের কাধে হাত রেখে বলল মুন্না।

“হ বস। আপনি যে তিনদিকে আগুন লাগাইতে কইসেন, এই বুদ্ধিটা বস ওয়ান পিস। চোখের পলকে সব আগুনে শেষ।”

“হ চল। এখন বসের বাড়িতে গিয়া খেলাটা দেখি গিয়া। ইশ, মেসির খেলাটা দেখা হইল না।” এই বলে ধীর পদক্ষেপে হাটা দিল উঠতি সন্ত্রাসী মুন্না ওরফে কাবাব মুন্না। তার মুখে তখন স্বস্তির হাসি।

* * *

মি. সান্টুর ধারণাই সত্যি হল।

সত্যি সত্যি কেউই এই ঘটনাটি খেয়াল করল না। ঘটনার পরদিন সকল পত্রিকার নগর সংস্করণ জুড়েই ছিল ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার উত্তেজনাকর কোয়ার্টার ফাইনালের খবর। মেসি কিভাবে হ্যাটট্রিক করল, তাকে কে পাস দিল, এই গোলগুলো নিয়ে কোন কোচ কি বললেন, খেলাটি নিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য, এই সব খবরেই পত্রিকার পাতা সব শেষ।

শুধুমাএ একটি মাএ পত্রিকাতে আগুনের ঘটনাটি ছাপা হল। তবে খুবই ছোট করে। শিরোনাম "বস্তিতে আগুন । নিহত ২, আহত ৫।"

* * *

পত্রিকার ক্লিপিংটিতে চোখ বুলাচ্ছে অপু। তার সামনে একই রকম আরো বেশ কয়েকটি ক্লিপিং। প্রতিটিই বিভিন্ন বস্তি সংক্রান্ত। তার কেন জানি মনে হয় এই বস্তির ঘটনাগুলো যে ঘটে, তার অনেকগুলো ঘটনাই নিছক দুর্ঘটনা নয়। এগুলোর পিছনে আরো অনেক ঘাপলা আছে। তাই সে ঠিক করেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করে জমা দেবে সম্পাদকের কাছে। এই ব্যাপারে সে অনুমতিও নিয়েছে সেকশন এডিটরের কাছ থেকে।

অপু যে পত্রিকাটিতে সম্প্রতি যোগ দিয়েছে, এটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকা। সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতেই এমন একটি পেপারে চাকুরি পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। তবে অপুর এই সাফল্যে কেউই তেমন একটা অবাক হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে রেকর্ড মার্ক পেয়ে পাশ করা অপুর যে চাকুরির অভাব হবে না, তা তার আশে পাশের সকলেই জানতেন।

চাকুরি পাওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসে সে সকলেরই নজরে পড়ে যায়। একদিকে তার ঈর্ষণীয় রেজাল্ট, এবং অপরদিকে তার লেখার দক্ষতা, সবকিছু মিলিয়ে সে যে একটা এসেট, তা বুঝতে সম্পাদকের দেরি হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার অনেক আগ থেকেই অপুর স্বপ্ন সাংবাদিক হওয়ার। এই স্বপ্ন দেখার শুরু মূলত ছোটবেলা থেকে। অপুর একমাএ মামা ছিলেন মফস্বলের একটি পত্রিকার সাংবাদিক। মফস্বলের সংবাদপত্র হওয়াতে এই পত্রিকাটি কখনোই জাতীয় পর্যায়ে আসতে পারেনি। তবে মফস্বলের সাংবাদিক হওয়া সত্বেও অপুর মামা আফজালের সাহসী সাংবাদিকতার সুনাম তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার সহকর্মী থেকে শুরু করে মফস্বল শহরটির শিক্ষিত মহলে তার সততা এবং সাহসিকতার কারণে তার অন্যরকম এক ইমেজ তৈরী হচ্ছিল।

কিন্তু তার সাংবাদিকতা জীবন খুব একটা দীর্ঘায়িত হয়নি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ লেগে যাওয়ার পর পেশাগত দায়িত্ব পালন কালে তিনি পাকিস্তান আর্মির হাতে প্রাণ হারান। তখন তাদের এলাকাতে সবেমাত্র পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্প গড়েছে। তারা বিভিন্ন লোকদের

আটক করে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করছে। এরকমই এক সময়ে মি. আফজাল জীবনের ঝুকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্পের কাছাকাছি এক এলাকায়। তার উদ্দেশ্য ছিল আর্মি বন্দীদের উপর কি ধরণের অত্যাচার নির্যাতন করছে, তার সংবাদ সংগ্রহ করা। কিন্তু লুকিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান এবং আর্মির গুলিতে প্রাণ হারান।

এই এসাইনমেন্টটি করার আগে তার সহকর্মীরা তাকে বার বার নিষেধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের কারোর কথা শোনেননি। তাকে মেরে ফেলার পর পাকিস্তান আর্মি তাদের সংবাদপএ অফিসটিতেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

অপু তার মামার সাহসিকতার গল্প শুনেছে তার মায়ের মুখে। তার বিধবা মামী তাকে বলেছেন তার মামা আফজাল কতোটা পাগলাটে ধরণের সাংবাদিক ছিলেন। তিনি নাকি সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন। পরিবারের কথা নাকি তার মনে থাকতো না। এর জন্য প্রতিনিয়ত নাকি মামীর সাথে ঝগড়াঝাটি হতো। মামী সেই সকল দিনের কথা স্মরণ করে এখন চোখের পানি মোছেন এবং আক্ষেপ করেন।

অপুর মামা কোন জাতীয় স্বীকৃতি পাননি। তাকে কোন বীর খেতাবও দেয়া হয়নি। কিন্তু তারপরও অপুর শিশুমনে এই ঘটনাগুলি দাগ কাটে অন্যরকমভাবে। অপু তার মামাকে কখনো দেখেনি। তবুও মামার জন্য এক অন্যরকম টান সে অনুভব করে। সে যতোই বড় হয়েছে, ততোই সে বুঝতে পেরেছে তার মামা ছিলেন অনেক বড় মাপের এক সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তিনি কখনোই কোন কিছুর সাথে আপোস করেননি।

শহীদ আফজালের এই সাহসিকতা এবং নির্ভীক সাংবাকিতাই অপুকে সাংবাদিক পেশায় আগ্রহী করে তোলে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়েও অর্থনীতি কিংবা ব্যবসায় প্রশাসন সাবজেক্ট না নিয়ে সে বেছে নিয়েছে গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা সাবজেক্টটি। তার দু'চোখ ভরা স্বপ্ন, সে একদিন তার মামার মতোই অনেক বড় সাংবাদিক হবে। দেশ ও দশের মঙ্গালের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করবে।

এই সময়ে অনেকে তাকে ভবিষ্যতে সাংবাদিক হওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। বলেছেন, সাংবাদিকদের এখন আর পেটে ভাত নেই। এই পেশার এখন আর চাকুরির কোন নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু তাদের কথায় কান দেয়নি অপু। তার বিশ্বাস, ভাল কিছু করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শুধু টাকা পয়সা দেখলেই হবে না।

তাই শীর্ষস্থানীয় পেপারটিতে চাকুরি পাওয়ার এপয়েন্টমেন্ট লেটারটি যখন তার হাতে পৌঁছাল, তখন সে আনন্দে মা'কে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "মা, আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। দেখে নিও, আমি একদিন অনেক বড় সাংবাদিক হব।" তার মা-ও তার মাথায় হাত রেখে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, "হ্যা বাবা, আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তুই একদিন অনেক বড় সাংবাদিক হবি।"

চাকুরি পাওয়ার পরই সে অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি এসাইনমেন্ট সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তাই সে এখন নিজেই নিজের এসাইনমেন্ট তৈরী করছে।

সে বস্তির এই ঘটনাটি নিয়েছে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে। তার ধারণা আদৌ ঠিক আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য সে একাধিকবার বস্তিটিতে গিয়েছে। কথা বলেছে সেখানে বসবাসরত একাধিক ব্যক্তির সাথে। সে জানতে পেরেছে, এই বস্তির যায়গা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। তাই তার ধারণা হল এর যে কোন একটি পক্ষ ষড়যন্ত্র করে এই আগুন লাগানোর কাজটি করলেও করতে পারে।

তার ধারণা যে অনেকটাই ঠিক, সেই ব্যাপারে সে প্রথম দিনই একটি ক্লু পেয়ে যায়। সে জানতে পারে, সবাই যখন টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিল, তখন চিৎকার শুনে সবাই বাইরে এসে দেখে আগুন লেগেছে বস্তির তিনটি দিক থেকে। আগুন লাগার ঘটনাটি যদি দুর্ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে তো তিনদিকে আগুন লাগার কথা নয়। লাগার কথা একদিকে এবং পরে ছড়িয়ে পড়ার কথা।

তাই সে বিভিন্ন জনকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকে এই আগুন লাগার সময় কেউ কি কাউকে আগুন লাগাতে দেখেছে কিনা। সবাই তাকে না সুচক উওর দিয়েছে।

এভাবে সারাদিন পার করেও সে এমন কাউকে খুঁজে পায়নি যে আগুন লাগার সময় টিভি রুমের বাইরে ছিল। দ্বিতীয় দিন সে বস্তির মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু মহিলারা কেউই তার সাথে উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে আসেনি। বরং এড়িয়ে গেছে।

এভাবে দুইদিন চলে যাওয়ার পরও তার তদন্তে কোন প্রকার অগ্রগতি হলো না। কিন্তু তার মনে একটাই খটকা। আগুন তিন দিকে লাগল কেন? লাগার তো কথা একদিকে।

এভাবে তৃতীয় দিন সবাইকে জিজ্ঞেস করতে করতে দুপুর বেলা সে গরমে ক্লান্ত হয়ে একটি ছায়ায় বসে পড়ল। তার শার্ট ঘামে পুরো ভিজে গেছে। তার কিছুটা দুরে দুটি

বাচ্চা ছেলে খেলছে। একটি বাচ্চা বয়সে বড়। সে অন্য বাচ্চাটির দিকে পাথর ছুড়ে মারছে, আর অন্য বাচ্চাটি তা ধরার চেষ্টা করছে।

সে বাচ্চাটিকে দেখে মনে মনে ঠিক করল শেষ চেষ্টা হিসাবে বাচ্চাটিকে একবার ঘটনাটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা যাক।

তাই সে ডাকল, "এই যে বাবা, তুমি আসো তো এদিকে।"

বাচ্চাটি তার খেলা থামিয়ে অপুর দিকে তাকাল।

তার দিকে তাকাতে দেখে অপু তাকে আবারো হাত দিয়ে কাছে আসার জন্য ডাকল। তবে আরো নরম সুরে।

বাচ্চাটি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কিছু বলল না। কাছেও আসল না।

সে এবার নিজেই উঠে গিয়ে বাচ্চার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে শোন, তুমি কি কাউরে ঐদিন আগুন লাগাইতে দেখস?"

কিন্তু তারপরও বাচ্চাটি নিরুওর।

অপু একই প্রশ্ন আবার করল। কিন্তু তারপরও বাচ্চাটি কথা বলতে রাজি হল না।

অপু বুঝল এভাবে কাজ হবে না।

সে কিছুদুরের একটি দোকান থেকে কয়েকটি চকলেট কিনে নিয়ে এসে বাচ্চাটিকে দিয়ে আদর মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে কোন বাজে লোককে সেই রাতে আগুন লাগাতে দেখেছে কিনা।

এবার বাচ্চাটি মুখ খুলল। বলল, "আমি কিচ্ছু জানি না।"

তার উওরে কেন জানি অপুর মনে হল বাচ্চাটি এমন কিছু জানে যা সে লুকাতে চাচ্ছে।

তাই সে আবারো অনুরোধের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে কিছুক্ষণ পর উওর দিল, "মা কইসে কাউরে না কইতে।"

উত্তরটি শুনে অপু নিশ্চিত হল সত্যিই বাচ্চাটি কিছু লুকাতে চাচ্ছে। এই লক্ষণে অপুর উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

সে এবার অভয় দিয়ে বলল, "আমি পুলিশের লোক। আর তোমার মায়ের সাথে আমার কথা হইসে। উনি বলসে তোমারে বলতে।" অপু বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিল।

তার এই কথায় বাচ্চাটি আশ্বস্ত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অনেকটা গোপনে নীচু স্বরে বলল, "হ দেখসি। সেই রাইতে সবাই যখন টিভি দেখতাসিল, তখন তিনটা লোক আইসা চাইরদিকে আগুন লাগায়া দিসে।"

অপু বিস্ফোরিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ধারণা শতভাগ সত্যি।

অপু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তাদেরকে চেন?"

বাচ্চাটি বলল, "চিনি না, তবে একজনরে আগে এই বস্তিতে দেখসি।"

"তুমি তখন কি করতাসিলা?"

"আমি গেসিলাম বাথরুমে। আইসা ঘরে ঢোকার আগেই দেখি আগুন লাগায়া দিতাসে।"

"তাহলে তুমি এই কথা সবাইরে বলতাস না ক্যান?"

"আমি বাবা আর মা'রে বলসি। তারা কইসে এই কথা কাউরে না কইতে।"

অপু বুঝতে পারল কেন এই ঘটনা কেউ জানে না। এই দরিদ্র লোকগুলো তাদের জীবনের ভয়ে এই গোপন সত্যগুলো কাউকে বলেনি। ফলে সত্যটাও কারো কাছে প্রকাশ হয়নি।

সে পরদিন গেল কাছের থানাটিতে। সেখানে ওসি সাহেবের সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করল তিনি কি এই ঘটনাটির কোন তদন্ত করেছেন কি না।

ওসি সাহেব জানালেন, তারা একটি সাধারণ ডায়রি করেছেন, তবে কোন প্রকার তদন্তের প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ এটি একটি নিছক দুর্ঘটনা। এছাড়া কোন প্রকার অভিযোগও তার কাছে আসেনি।

তাই অপু ঠিক করল, এই বিষয়টি নিয়ে সে আরো গভীরে যাবে।

কিন্তু বিষয়টির তদন্ত সেখানেই থেমে যায়। এর কারণ ঘটনাটির কয়েকদিন পর সে হঠাৎ করেই ডাক পায় তার পত্রিকার সেকশন এডিটরের কাছ থেকে।

একদিন সকালে অফিসে আসতেই তার সহকর্মী আইরিন এসে অপুকে জানালো সেকশন এডিটর ইমতিয়াজ ভাই তাকে ডাকছেন।

অপু তার অফিসে ঢুকতেই তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি খবর অপু, কেমন আছ?"

"হ্যা ইমতিয়াজ ভাই। ভাল।"

"তুমি এখন কি করছ?"

"বস্তির আগুন লাগার ঘটনাটা নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করছি। আপনি তো জানেন। আমি তো আপনাকে সব বলেছি।"

"আচ্ছা। আমি তোমাকে একটা মোর ইন্টারেস্টিং কাজ দিচ্ছি। তুমি বস্তির রিপোর্টটি রেখে এই বিষয়টিতে মনোযোগ দাও।", এই বলে ইমতিয়াজ ভাই অপুর দিকে একটি ফাইল বাড়িয়ে দিলেন।

অপু ফাইলটা হাতে নিয়ে কিছুটা প্রতিবাদের সুরে বলল, "কিন্তু ইমতিয়াজ ভাই, আমার কাজটা তো এখনো শেষ হয়নি।"

"না, না। স্যার বলেছেন, এই কাজটিই আগে করতে। এটা মোর ইম্পর্টেন্ট।"

"কিন্তু ইমতিয়াজ ভাই, আমার তদন্ত তো শেষ হয়নি। আর আপনি তো জানেন যে এই তদন্ত এখন একটা নতুন টার্ন নিয়েছে।"

"না না, আমি যা বলছি তা কর। এই রিপোর্টটা মোর ইম্পর্টেন্ট। স্যার বলেছেন। আর এটা তোমার জন্যও ভাল।"

"কিন্তু.....", কথা আর শেষ করতে পারল না অপু।

"আহ হা, যা বলছি কর। কথা শোন।", জোরের সাথে বললেন ইমতিয়াজ ভাই।

অপু আর কিছু বলল না। সে আস্তে আস্তে ফাইলটি নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে আসল।

অপু বুঝল সত্যিই এই ঘটনাটিতে বড় ঘাপলা আছে। অনেক বড় ঘাপলা।

কাল্পনিক ঘটনা ২
সোবহান এমপি'র এতিমখানা

সংসদের এলিগেন্ট ক্যাফে'তে একসাথে বসে কফি পান করছেন মি. আব্দুস সোবহান এবং মি. হানিফ। সংসদ অধিবেশনের বিরতি চলছে। তাই এই সময়ের মধ্যে কফি খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করার জন্য অনেক সাংসদই ভিড় করেন এই ক্যাফে'তে। এখানে কফি'র সাথে পাওয়া যায় চা, বিস্কুট, ক্রোসাঁ, ডোনাট, এবং কোল্ড ড্রিংকস। খাওয়ার মান ভাল হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই ক্যাফে।

বিরোধী দল থেকে এবারে নির্বাচিত হয়েছেন মি. হানিফ। তার এলাকায় তিনি বারবারই নির্বাচিত হয়ে আসছেন। বিগত পাঁচ বছরে তিনি ছিলেন মন্ত্রী। তবে এবারে তার দল হেরে যাওয়াতে মন্ত্রীত্বের সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মি. আব্দুস সোবহান। সরকারি দলের এমপি নির্বাচিত হওয়াতে ক্ষমতাও যেমন তার হাতে এসেছে, তেমনি মন্ত্রীভাগ্যও অনুকূল থাকাতে তার কপালে জুটেছে একটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর পদ। বয়সে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক ইয়াং হলেও নিজের ব্যবহার, এবং নেটওয়ার্কিং ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারি দল এবং বিরোধী দলের অনেকেরই প্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন মি. সোবহান।

আলাপ শুরু করলেন মি. সোবহানই।

মি. সোবহানঃ কি হানিফ ভাই, খবর-টবর কি?

মি. হানিফঃ আরে ভাই, খবর তো এখন তোমাদের। তোমরা হইলা গিয়া মন্ত্রী। ভাবসাবই আলাদা। তোমাদের খবর বল।

মি. সোবহানঃ খবর আর কি। মন্ত্রীত্ব যে এতোটা কঠিন আর ঝামেলার তাতো আগে বুঝি নাই। একটা ঝামেলা শেষ না হইতেই আরেকটা ঝামেলা আইসা যায়। আর সচিবগুলারে নিয়া হইসে আরেক সমস্যা। সামনে সামনে খালি জ্বি স্যার, জ্বি স্যার করে। কিন্তু পিছনে গিয়া কাজটা করে উল্টা।

মি. হানিফঃ আরে টাইট দেও। টাইট দেও। টাইট না দিলে এরা একটাও ঠিক থাকবো না।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন মি. হানিফ।

মি. সোবহানঃ হানিফ ভাই। কিছু টিপস-টুপস দেন না।

মি. হানিফঃ কিসের টিপস? তোমাদের আবার টিপস লাগবো নাকি? তোমরা তো এই যুগের পোলাপান। আ' কইতেই আমড়া বুইঝা ফালাও।

মি. সোবহানঃ আরে হানিফ ভাই, আপনি এতো অভিজ্ঞ। মাশাল্লাহ গাড়ি-বাড়ি তো কম করেন নাই। তারপরও আপনার নামে কোন অভিযোগ নাই।

মি. হানিফঃ হ, সেইটা অবশ্য ঠিকই কইস। তবে বেক্কলের মতো পয়সা চাইলে তো ধরা পড়বাই। আমি এতোটা বেক্কল না বইলাই মনে হয় কপাল পুড়ে নাই।

মি. সোবহানঃ হ, হানিফ ভাই। সেই টিপস'ই তো চাইতাসি। আমরাতো আপনাগো মতো এতোটা বুদ্ধিমান এখনো হই নাই। তাই বুদ্ধিমান হওয়ার তরিকা জানার জন্যই তো আপনারে জিগাইতাসি।

মি. হানিফঃ ক্যান? তোমার মন্ত্রণালয়ে তো অনেক বিদেশীর আসা-যাওয়া। সেইগুলা একটারে ধর। এই রকম একটারে ধরলেই তো কেল্লাফতে।

মি. সোবহানঃ আরে কি বলেন? বিদেশী ধইরা মরমু নাকি? কখন না কখন এমবেসীতে বইলা বারোটা বাজায়া দিব। তারপর প্রধানমন্ত্রীর কানে গেলে তো আমার চাকরি নিয়াই টানাটানি পড়ব।

মি. হানিফঃ এর লাইগ্যাই কইলাম বেক্কলের মতো ঘুষ চাইও না। বিদেশী ধরার তরিকা আলাদা।

মি. সোবহানঃ বলেন কি? বিদেশীদের লগেও কি দুইনাম্বারী চলে নাকি?

মি. হানিফঃ মিঞা। দুই নাম্বারী কি কও। আমরা যদি দুই নাম্বার হই, হেরা হইল গিয়া চাইর নাম্বার। তোমারে আমারে নামতা পড়া শিখাইতে পারব।

মি. সোবহানঃ হানিফ ভাই, হানিফ ভাই, একটু বলেন না। প্লিজ।

রীতিমতো অনুনয় ঝরে পড়ল মি. সোবহানের কণ্ঠে।

মি. হানিফঃ ওই মিঞা, তুমি তো কম ধান্ধাবাজ না। পবিএ সংসদের পবিএ ক্যাফে'তে বইসা এইসব কথা জিগাও। হিঃ হিঃ। এইসব জানতে হইলে আমার বাসায় আসবা।

মি. সোবহানঃ তাহইলে একটু সময় দেন না। কবে আসুম।

মি. হানিফঃ আরে মিঞা, তোমরা হইলা গিয়া মন্ত্রী মানুষ। তোমাদের আবার সময় দিতে হইব ক্যান? যখন ইচ্ছা তখন চইলা আসবা।

এই সময় বিরতি শেষ হওয়ার বেল বেজে উঠল। কথা সংক্ষিপ্ত করে মি. হানিফ এবং মি. সোবহান দুজনেই কফি শেষ করার দিকে মনোযোগ দিলেন।

* * *

মি. সোবহান বসে আছেন তার অফিসে। তার সামনেই চেয়ারে বসা মি. আরিফুর রহমান। তিনি বহুজাতিক একটি কোম্পানির লোকাল এজেন্ট। কোম্পানিটি বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাস সংযোগ, সুইটেবল জমি, এবং সর্বোপরী সরকারি সহযোগিতা। সরকারি মন্ত্রীদের হাতে অনেক ক্ষমতা। তারা চাইলেই যে কোন কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করে দিতে পারেন। আর যদি না চান, তাহলে সেই বিনিয়োগ কোনদিনই বাংলাদেশে হবে না। তখন দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে সেই বিনিয়োগকারীকে।

মি. আরিফ এর সবকিছুই খুব ভালো মতো জানেন।

কিন্তু মি. সোবহান তাকে কোন আভাসই দিচ্ছেন না। তার সামনেই পড়ে আছে কোম্পানিটির একটি ফাইল। তিনি বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলছেন। বলছেন এই এপ্রুভাল দিলে সমস্যা হতে পারে।

মি. আরিফ তার নিজস্ব সূত্রে খবর পেয়েছেন মি. সোবহানের টাকা পয়সা নেয়ার ব্যাপারে তেমন একটা অভিযোগ নেই। তাই মি. আরিফও সাহস পাচ্ছেন না সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করার। এই নিয়ে বেশ চিন্তিত মি. আরিফ।

মি. সোবহান বললেন, "ঠিক আছে, আপনি আপনার বস কে বলুন আমার কাছে আসতে। আপনাকে বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। আপনি এই সমস্যা বুঝবেন না।"

“ঠিক আছে স্যার, কবে আসতে বলব?”, জিজ্ঞেস করলেন মি. আরিফ।

“আগামী রোববার সকাল নয়’টায় আসতে বলুন। তখন আমি ফ্রি থাকব।”

জ্বি স্যার বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন মি. আরিফ।

রোববার দিন কিছুটা সকাল সকালই চলে গেলেন মি. সোবহান। তিনি তার সেক্রেটারীকে বললেন, বাইরের কোন ভাল বেকারী থেকে নাস্তা নিয়ে আসতে।

ঠিক সকাল ন’টাতেই সেক্রেটারী ফোন করে জানালো এক বিদেশী ভদ্রলোককে নিয়ে মি. আরিফ এসেছেন। তারা দেখা করতে চান।

“ঠিক আছে। বিদেশী ভদ্রলোককে ভিতরে নিয়ে আস। আর মি. আরিফকে বল তোমার রুমে বসতে।”

বিদেশী ভদ্রলোক ভিতরে এসে গুড মর্নিং বলে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মি. সোবহানও হাত বাড়িয়ে গুড মর্নিং বলে তাকে সামনের সোফায় বসতে অনুরোধ করলেন।

বিদেশী ভদ্রলোক তার ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলেন।

কার্ডটি নিয়ে মি. সোবহান দেখলেন ভদ্রলোকের নাম James Carleton। তিনি কোম্পানিটির এই অঞ্চলের হেড।

মি. সোবহানও তার কার্ডটি বাড়িয়ে দিলেন।

Mr Carleton ই আলাপ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি ধন্যবাদ জানালেন মি. সোবহানকে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য।

মি. সোবহানও তার কথা শুনে ওয়েলকাম বলে মাথা ঝাকালেন।

আলাপ চলল প্রায় এক ঘন্টা। এই সময়ের মধ্যে মি. সোবহান কোম্পানিটির বিনিয়োগ প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন। তিনি জানালেন এই ধরণের বিনিয়োগ যদি বেশী বেশী হয়,

তাহলে এতে দেশেরই লাভ। বর্তমান সরকারও বিদেশী বিনিয়োগ আনার ব্যাপারে অনেক সিরিয়াস।

Mr Carleton জানালেন বাংলাদেশ এখন তাদের প্রায়োরিটি লিস্টে এক নাম্বার। দেশের জনসংখ্যা যতো বাড়ছে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ততোই বাড়ছে। তাই তার মতে এই ধারা চলতে থাকলে আগামীতে আরো অনেক কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে ভিড় জমাবে।

এই সময় অফিস এসিসট্যান্ট নাস্তা নিয়ে রুমে ঢুকল। নাস্তার মেনু চীনাবাদাম, ফ্রুট কেক এবং চা।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মি. সোবহান ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি জানতে চাইলেন Mr Carleton কোথায় উঠেছেন। তার ছেলে মেয়ে কয়টি। তারা কোথায় আছে, ইত্যাদি।

Mr Carleton ও জানতে চাইলেন মি. সোবহান সম্পর্কে। এই ফাঁকে মি. সোবহান তাকে জানিয়ে দিলেন এবারে নির্বাচিত হয়ে আসতে তার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তিনি এখন শুধু মন্ত্রীত্বই করেন না। করেন সমাজসেবাও। তার গ্রামে তিনি একাধিক স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার এখন ইচ্ছা একটি এতিমখানা খোলার। তার উদ্দেশ্য শহরতলিতে যে সকল এতিম পথশিশু আছে, তাদেরকে পুনর্বাসিত করা। শিক্ষিত করে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। তবে এর জন্য প্রয়োজন ফান্ড। তাই তিনি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ফান্ডের জন্য আবেদন করেছেন।

Mr Carleton তার এই শুভ উদ্যোগের খুব প্রশংসা করলেন। তিনি মি. সোবহানকে জানালেন তাদের গ্রুপের একটি ফাউন্ডেশন আছে। এই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র দেশের এই ধরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা। Mr Carleton জানালেন তিনি খুব খুশি হবেন যদি মি. সোবহান সরাসরি সেই ফাউন্ডেশনে ফান্ডের জন্য আবেদন করেন। আবেদনের নিয়মাবলী পাওয়া যাবে ফাউন্ডেশনটির ওয়েবসাইটে। তিনি ওয়েবসাইটের ঠিকানাও দিলেন।

এভাবে আলাপচারিতা চলল আরো কিছুক্ষণ। সবশেষে মি. সোবহান জানালেন এই ফাইলের এপ্রুভাল দিলে সমস্যা হতে পারে, তবে তিনি ঝুকি নিয়ে হলেও এই এপ্রুভাল দিবেন। কারণ তিনি সত্যি সত্যি চান এই বিনিয়োগটি যেন দ্রুত হয়।

বৈঠক শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে রুম থেকে বের হয়ে এলেন Mr Carleton। মি. আরিফ তখন পিএস এর রুমে বসে গরমে ঘামছেন।

Mr Carleton রুম থেকে বেরিয়ে যেতেইইয়েস বলে চাপা উল্লাস প্রকাশ করলেন মি. সোবহান।

কাজ হয়েছে!

হানিফ ভাইয়ের টিপসে কাজ হয়েছে!

এই সুসংবাদটি আজকেই জানাতে হবে হানিফ ভাইকে।

মি. সোবহান মনে মনে ঠিক করলেন কিভাবে এতিমখানাটি খুলবেন। এর জন্য প্রথমেই এনজিও ব্যুরোতে আবেদন করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন প্রথম দফায় প্রায় ১ লক্ষ ডলার অনুদান হিসাবে চাইবেন। পরবতীতে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে এই টাকার পরিমাণ বাড়াবেন।

তবে মি. হানিফকে এই সুসংবাদ জানানোর আগে মি. সোবহান ফোন করলেন তার ভাতিজা রিপনকে। মি. সোবহানের ব্যক্তিগত সকল বিষয় রিপনই দেখাশোনা করে। তিনি রিপনকে বললেন সে যেন এনজিও ব্যুরোতে গিয়ে একটি এনজিও কি করে খোলা যায় এবং কার নামে খোলা যেতে পারে, সেই ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়। আর সে যেন এই বিষয়টি নিয়ে ইংরেজিতে একটি চিঠি ড্রাফট করে নিয়ে আসে।

রিপন চাচা'র সাথে কথা বলা শেষে ফোন করল তার প্রিয় বন্ধু ফিরোজকে। রিপন আবার ইংরেজিতে একটু কাঁচা। তাই এই ধরণের কাজে বাল্যবন্ধু ফিরোজই একমাএ ভরসা।

কাল্পনিক ঘটনা ৩
‘দুর্নীতিবাজ’ সিদ্দিকুর রহমান

মি. সিদ্দিকুর রহমান সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী। তিনি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক জীবনে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে আজকের এই অবস্থানে এসেছেন। তাকে জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে, তবে এই চ্যালেঞ্জগুলো নিতে গিয়ে তিনি তার সততার প্রশ্নে কখনো আপোস করেননি।

মি. সিদ্দিক শুধু একজন সৎ ব্যক্তি নন। তিনি একজন দক্ষ ব্যক্তিও বটে। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার আগে এর বিভাগগুলির লোকসান ছিল ব্যাপক। তবে তার দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি সমস্যার মূলে গিয়ে প্রতিটি বিভাগের সংস্কার করেন, এবং এর সুফল কিছুদিনের মধ্যেই সবার নজরে পড়ে। তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এখন আর কোন লোকসানী বিভাগ নেই।

তার এই সাফল্য মিডিয়ারও নজর কেড়েছে। বিগত বছরগুলিতে তার একাধিক ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপএগুলিতে। তাই সর্বমহলে তার একটি সৎ এবং দক্ষ ইমেজ গড়ে উঠছে।

তার এই সততা এবং দক্ষতার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও তাকে বিশ্বাস করেন আগের চেয়ে অনেক বেশী। বিগত দিনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী তাকে নিজের অফিসে ডেকে নিয়ে অন্যান্য অনেক বিষয়েরও দায়িত্ব দিয়েছেন। মি. সিদ্দিকুর রহমানের উপর প্রধানমন্ত্রীর আস্থা যে দিন দিন বাড়ছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

সিদ্দিক সাহেবের মনে তার এই সততা এবং তার উপর প্রধানমন্ত্রীর ক্রমবর্ধমান এই আস্থা নিয়ে এক প্রকার চাপা গর্ব রয়েছে। এই গর্ব মাঝে মাঝেই প্রকাশ হয়ে যায় তার সাথে কথা বলার সময়। এই কারণে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রী রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়, তারা মি. সিদ্দিককে খুব একটা পছন্দ করেন না। মি. সিদ্দিকও এই ব্যাপারটি জানেন। তবে এই বিষয়টি নিয়ে কোন মন্ত্রী এখন পর্যন্ত তার সাথে কোন প্রকার বেয়াদবি করার সাহস পায়নি। তাই সিদ্দিক সাহেব এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না।

সাম্প্রতিককালে সিদ্দিক সাহেবের আওতাধীন একটি বিভাগে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বিশালাকার একাধিক ক্রেন কেনা হবে। এর জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। টেন্ডারে অংশ নিয়েছে একাধিক বিদেশী কোম্পানি। টেকনিক্যাল কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে

দুটি কোম্পানিকে যোগ্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। এর মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। তাই এই সিদ্ধান্তের ফাইলটি সচিব মহোদয় নিয়ে এসেছেন মি. সিদ্দিকের অফিসে।

মি. সিদ্দিক ফাইলটি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখলেন। কোম্পানি দুটির প্রোফাইল সহ ক্রেনগুলির সচিএ প্রতিবেদনও তার সামনে।

সিদ্দিক সাহেব কিছুক্ষণ দেখে সচিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই ক্রেনগুলো যেন কেমন কেমন। আমার মনে হয় এই কোম্পানিটাই ভাল। আপনার কি মনে হয়?"

সচিব সাহেব সাথে সাথে বললেন, "জ্বি স্যার। দ্বিতীয় কোম্পানিটাই ভাল হবে।"

সিদ্দিক সাহেব বললেন, "ঠিক আছে। আমি ফাইলটি সই করে দিচ্ছি। আপনি এই ফাইলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পাঠিয়ে দিন।"

জ্বি স্যার বলে সচিব মহোদয় চলে গেলেন।

এখানে বলা দরকার দ্বিতীয় কোম্পানিটির লোকাল এজেন্ট আসলে সিদ্দিক সাহেবেরই শালা রিংকু!

রিংকু এই কোম্পানিটির এজেন্ট হয়েছে কয়েক বছর আগে যখন মি. সিদ্দিক ছিলেন অন্য আরেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। এখন পর্যন্ত সে তার কোম্পানির হয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকটি টেন্ডারে অংশ নিয়েছে। সে ছোট-মাঝারি বেশ কয়েকটি কন্ট্রাক্টও পেয়েছে। তবে এর আগে তার ভাগ্যে এমন বিশাল কন্ট্রাক্ট আর জোটেনি।

তাই এবার দুলাভাইয়ের বদান্যতায় যাতে একটি বড় কন্ট্রাক্ট জোটে তার জন্য সে বেশ কিছুদিন আগ থেকেই তার বড় আপাকে ধরেছিল একটি ফেভারের জন্য।

রিংকু বড় হয়েছে সিদ্দিক সাহেবের বাসাতেই। বড় বোন এবং ছোট ভাইয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান বিস্তর। সিদ্দিক সাহেব যখন রিংকুর বড় বোন ইয়াসমিনকে বিয়ে করেন আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে, তখন রিংকুর বয়স মাএ ১০। বিয়ের কিছুদিনের মাথাতেই রিংকুর বাবা মারা যান।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই রিংকুর পড়াশোনার দায়িত্ব নেন সিদ্দিক সাহেব।

মেধাবী রিংকু পড়াশোনাতে বেশ মনোযোগী ছিল। এসএসসি এবং এইচএসসিতে সে স্টার মার্ক পেয়েছিল। অল্পের জন্য স্ট্যান্ড করতে পারেনি। এইচএসসি পাশ করার পর সে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং বিভাগে। অনার্স এবং মাস্টার্স কৃতিত্বের সাথে পাশ করার পর সে ঢুকে যায় একটি ট্রেডিং কোম্পানিতে।

তার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসা করা। তাই সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসার কলাকৌশল শিখে কয়েক বন্ধু মিলে দিয়ে দেয় নিজেদেরই একটি ট্রেডিং কোম্পানি। এভাবে বছর দশেকের মাথাতেই সে মোটামুটি বড় একটি পুঁজি গড়ে তোলে। তারপর শুরু হয় তার বিদেশী কোম্পানির সাথে যোগাযোগ। বন্ধু-বান্ধব এবং বিভিন্ন ক্লাবের শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে সে একটি ভাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে যার কারণে সে কিছুদিনের মধ্যেই একটি বৃহৎ কোম্পানির লোকাল এজেন্ট হতে সমর্থ হয়।

রিংকুর এই উত্থান সিদ্দিক সাহেবের চোখের সামনেই। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সিদ্দিক সাহেবের বাসায় থাকলেও সে সিদ্দিক সাহেবের কাছে কখনো কোন সাহায্যের জন্য আসেনি। সিদ্দিক সাহেবও তাকে আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেননি।

এমনিতেই শুরু থেকেই সিদ্দিক সাহেবের রাশভারী প্রকৃতির কারণে রিংকু তাকে কিছুটা এড়িয়ে চলে। তার উপরে বাবা না থাকাতে ভারিক্কি স্বভাবের দুলাভাইয়ের সাথে রিংকু কখনোই সহজভাবে মিশতে পারেনি। সিদ্দিক সাহেবও আগ বাড়িয়ে এই দুরত্ব কমাননি। মনে করেছেন, ছেলেটা যখন ভালোই করছে, তাই সে নিজেই নিজেই উঠে দাঁড়াক।

তবে বিগত নির্বাচনের জয়ের আগ থেকে রিংকু সিদ্দিক সাহেবের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করেছে। সে তার নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছে। নিজের পকেট থেকেই অনেককে অনেক টাকা দিয়েছে। সিদ্দিক সাহেবও এতে মানা করেননি।

রিংকুর উদ্দেশ্য সিদ্দিক সাহেব ভালোই বুঝেছেন। রিংকু এখন সিদ্দিক সাহেবের কাছ থেকে একটি ফেভার চায়। তবে রিংকু কখনোই এই কথাটি সিদ্দিক সাহেবের কাছে মুখ ফুটে বলেনি।

বরং সে ধরেছে তার বড় আপাকে।

মিসেস ইয়াসমিন প্রায়শই আজকাল রিংকুর ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা ডিনার টেবিলে সিদ্দিক সাহেবের কাছে তুলছেন। তিনি বলছেন, রিংকু আজকাল ভাল ব্যবসা করছে। ধীরে ধীরে তার উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি সে বেশ কয়েকটি ভাল কাজ শেষ করে সবার কাছ

থেকে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। তবে তার কাছের লোকরা যদি এখন তাকে সাহায্য না করে, তাহলে সে আরো উপরে উঠতে পারবে না।

সিদ্দিক সাহেব তার প্রিয়তমা স্ত্রীর এই ধরণের আলাপচারিতায় কোন মন্তব্য করেননি।

মিসেস ইয়াসমিনও বুঝতে পারছেন না তার স্বামীর অবস্থান।

তাই মিসেস ইয়াসমিন একদিন না পেরে কিছুটা জেদি কণ্ঠেই বলে উঠলেন, "জানো, লুবনা ভাবী আজ সকালে বলছিলেন তার ভাই রতনের কথা। সে নাকি কিছুদিন আগেও সাইকেল চালিয়ে তার বাসায় আসতো। অথচ এখন নাকি তার বিশাল বাড়ি, পাজেরো গাড়ি। সে নাকি কিছুদিন পর পর সিঙ্গাপুরে ফুল ফ্যামিলি নিয়ে চেক আপে যায়। এর সবকিছুই নাকি হয়েছে মাসুম ভাইয়ের কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রীও নাকি জানেন ব্যাপারটা। কিন্তু তিনি নাকি কিছুই বলেননি। আসলে তুমি কিছু পার না। তোমার সেই সাহসও নেই।"

স্ত্রীর এই কথায় মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে রীতিমতো তেতে উঠলেন মি. সিদ্দিকুর রহমান।

প্রিয়তমা স্ত্রীর এই খোঁচা সইতে না পেরে তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, নাহ, এবার একটা না একটা কিছু করতেই হবে রিংকুর জন্য।

তবে সিদ্দিক সাহেবও এতোটা বোকা নন যে তিনি রিংকুর জন্য করতে গিয়ে তার দীর্ঘদিনের নীতি এবং ইমেজ ভেঙ্গে ফেলবেন। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, রিংকুর প্রস্তাব যদি টেকনিক্যাল কমিটি পার হতে পারে, তাহলে কন্ট্রাক্টটা তিনি রিংকুর কোম্পানিকেই দিবেন। কিন্তু টেকনিক্যাল কমিটি পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। এখন টেকনিক্যাল কমিটি কিভাবে পার হতে হবে, সেটা রিংকুর ব্যাপার। তার নয়।

টেকনিক্যাল কমিটি পার হওয়ার পর তিনি সচিব সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন রিংকুর কোম্পানিটির ব্যাপারে। সচিব সাহেব এই কোম্পানিটির সম্পর্কে ইতিবাচক মন্ত ব্য করেছিলেন।

সিদ্দিক সাহেবের তখন মনে হতে লাগল, তাহলে কি রিংকু সিদ্দিক সাহেবের সাথে তার সম্পর্ক সবাইকে বলে পরোক্ষ সুবিধা নিয়েছে? কিংবা রিংকু তার শালা বলে সরকারি কর্মকর্তারা ভয়ে এই প্রস্তাবটির কোন বিরোধীতা করেনি?

কিন্তু তা কেন হবে? রিংকু তো এর আগেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজ করেছে। সেখানে তার সুনামও আছে। বিদেশী কোম্পানিগুলো তাকে এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছে তার যোগ্যতার কারণেই। শুধুমাএ সিদ্দিক সাহেবের কারণে নয়।

আর সরকারি কর্মকর্তারা যদি তাকে ভয় পেয়েই কিছু না বলে, সেটা তো তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এখানে তার কি করার আছে? তিনি তো তাদেরকে এই প্রস্তাবটির ব্যাপারে কিছু বলেননি।

তাই রিংকুর এই কন্ট্রাক্ট পাওয়াতে শুধু সিদ্দিক সাহেবের বদান্যতাই কাজে লাগেনি, বরং রিংকু এই কন্ট্রাক্ট পেয়েছে তার যোগ্যতা বলেই। এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলেন মি. সিদ্দিক।

তিনি ফাইলটিতে সই করলেন। তারপর পিএস কে বললেন ফাইলটি সচিব মহোদয়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সাতদিন পরের ঘটনা। সিদ্দিক সাহেব সকাল সকাল অফিসে এসেছেন। অফিসে আসার পরই তার প্রথম কাজ পেপারগুলিতে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া।

পেপারগুলো হাতে নিতেই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

শীর্ষস্থানীয় একটি পেপারের হেডলাইন তাকে নিয়েই!

হেডলাইনে লেখা, "দুইশ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট পেল প্রভাবশালী মন্ত্রীর শালা!"

এর পাশেই একটি রঙ্গীন কার্টুন। যেখানে দুইজন ব্যক্তি জড়াজড়ি করে আইসক্রিম খাচ্ছে। তাদের দুই পকেট থেকে গড়িয়ে পড়ছে টাকা।

কার্টুনটিতে আকা ব্যক্তি দুইজনের একজন যে তিনিই, সেটা যে কেউই বলে দিতে পারবে। কিন্তু রিংকুর চেহারাটা অবশ্য ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না।

ঘামতে ঘামতে তিনি রিপোর্টটি পড়লেন।

রিপোর্টটিতে তেমন কোন গুরুতর অভিযোগ আনা হয়নি। পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত বলা হয়েছে। তার নামও বলা হয়েছে। তবে এটা বলা হয়নি যে রিংকুর প্রস্তাবটি টেকনিক্যাল

কমিটি পার হয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, রিংকু যে আরো অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে নিজের যোগ্যতাবলে আগে কাজ পেয়েছে, সেটাও বলা হয়নি। আবার এটাও বলা হয়নি, রিংকুর যে কোম্পানিটি কাজ পেয়েছে, সেটি একটি যোগ্য কোম্পানি। তাই এতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয়নি।

বরং রিপোর্টটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠকদের মনে হতে পারে সিদ্দিক সাহেবের শালা হওয়া ছাড়া রিংকুর আর কোন যোগ্যতা নেই। রিপোর্টটিতে শেষ যে লাইনটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা দিয়ে পাঠকদের মনে এক প্রকার সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই লাইনে বলা হয়েছে, "এই ধরণের টেন্ডারে যে আকাশ সমান দুর্নীতি হয় তা সকলেই স্বীকার করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি সুএ জানায়, বিশাল অঙ্কের এই টেন্ডারটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা কল্পনা চলছিল অনেক দিন থেকেই। এর জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করতে রাজি ছিলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কন্ট্রাক্টটি পেলেন খোদ মন্ত্রীর শালা আসিফ আহমেদ রিংকু।"

এখন সিদ্দিক সাহেব কি করবেন?

তিনি কি এর প্রতিবাদ পাঠাবেন?

প্রতিবাদ পাঠিয়ে কি হবে? প্রতিবাদের সাথে সাথে "প্রতিবেদকের বক্তব্য" নাম দিয়ে উল্টো আরেক ব্যাখ্যা ছাপিয়ে দেয়া হবে। আর প্রতিবাদও পাঠাবেন কি করে? এখানে তাকে তো সরাসরি কোন অভিযোগ করা হয়নি। বরং পাঠকের মনে একটি সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে এই কন্ট্রাক্টে তিনি দুর্নীতি করেছেন।

তিনি দিব্যচোখে দেখতে লাগলেন কয়েকদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশ করবে এই নিয়ে বিভিন্ন পাঠকদের পাঠানো চিঠি কিংবা আর্টিকেল যার মাধ্যমে তিনি যে একজন বড় দুর্নীতিবাজ, তিনি যে স্বজনপ্রীতি করে এক বিরাট অন্যায় করে ফেলেছেন, সেটাই ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হবে।

তাহলে তিনি কি প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিবেন?

তিনি ভাবতে লাগলেন, কেন এই রিপোর্টটি ছাপা হল।

তার মনে হল, এই পত্রিকার সম্পাদককেই মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি এক পার্টির ডিনার টেবিলে সবার সামনেই কিছুটা অপমান করেছিলেন। অন্যান্য সম্পাদককদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেও তিনি এই সম্পাদকের সাথে হ্যান্ডশেক করেননি। ইচ্ছা করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তার সম্পাদিত পত্রিকাটিতে "নেপথ্যের কলাম" নামে একটি কলাম রয়েছে যেখানে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। এই সকল অভিযোগের অনেকগুলিই সঠিক, আবার অনেকগুলিই পুরোপুরি বানোয়াট। সম্পাদক এই কলামটিকে ব্যবহার করেন বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের অস্ত্র হিসাবে। তাই গুণীমহলে এই সম্পাদককে কেউই খুব একটা ভাল চোখে না দেখলেও তার পত্রিকার আবার কাটতি ব্যাপক। অনেক পাঠক রয়েছেন যারা এই সকল বানোয়াট নেপথ্যের তথ্য খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়েন। এই কারণে এই পত্রিকাটির সার্কুলেশন অন্যান্য অনেক পত্রিকার চাইতে বেশি। আর এই সার্কুলেশনের কারণেই এই সম্পাদককে কদর না দিয়ে কোন উপায় নেই।

মি. সিদ্দিকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হল, যে সকল মন্ত্রী তাকে দুচোখে দেখতে পারেনা, তারাই এই সম্পাদককে দিয়ে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সম্পাদকের স্বার্থ এবং দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের স্বার্থ, দুটি মিলে বলি হয়েছে মি. সিদ্দিকের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম।

ফাইলটি আগামীকালই প্রধানমন্ত্রী দেখবেন। তাহলে সিদ্দিক সাহেব কি প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন তাকে আরো কিছুটা সময় দিতে?

কিন্তু তাহলে তো তার দুর্বলতাই প্রকাশ হয়ে যায়।

আগামী মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে তিনি কিভাবে যাবেন?

তিনি দিব্যচোখে দেখতে পেলেন, তিনি যাওয়ার সাথে সাথেই তার সহকর্মীরা মুখ টিপে হাসছে। তাকে নিয়ে বলাবলি করছে।

তাহলে তিনি এখন কি করবেন?

ভাবতে ভাবতে কপালে ঘাম মুছলেন এক সময়ের প্রভাবশালী মন্ত্রী মি. সিদ্দিকুর রহমান।

কাল্পনিক ঘটনা ৪

ড. ইমরানের ভুল তত্ব

“ছবিতে আমাকে কেমন লাগছে বল তো?”, স্ত্রী জুলিকে জিজ্ঞেস করলেন ড. ইমরান।

“ভালোই, তুমি তো এমনিতেই হ্যান্ডসাম। এখানে আরো হ্যান্ডসাম লাগছে।”, ড. ইমরানের গালে একটি টোকা দিয়ে বললেন সুদর্শনা জুলি।

ড. ইমরান এবং তার স্ত্রী জুলি বসে আছেন তাদের লিভিং রুমের সোফায়। আলো আধারী পরিবেশ। সামনেই টিভিতে লো ভলিউমে একটি গানের অনুষ্ঠান চলছে। ড. ইমরানের হাতে আজকের পেপার। পেপারটিতে মূল শিরোনাম “উদ্বোধন হল স্বপ্নের প্রকল্প”। হেডলাইনের পাশেই একটি বড় রঙিন ছবি। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি অনুষ্ঠানের ফিতা কাটছেন প্রধানমন্ত্রী। তার একপাশে পরিবেশমন্ত্রী এবং অন্যপাশে ড. ইমরান। ড. ইমরান হাততালি দিচ্ছেন।

আজকে সারাটা দিনই খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে ড. ইমরানের। সকাল থেকেই কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের ভিড়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে ড. ইমরানকে একাধিক ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে প্রেস কনফারেন্স হবে আগামীকাল।

ড. ইমরানের পরামর্শতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে “স্বপ্নের প্রকল্প” নামে হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় বিগত সাত বছরে দুই দফায় প্রায় পনের হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ড. ইমরানই এই মডেলটির মূল প্রবক্তা। তিনি এই মডেলটি প্রকাশ করেন আজ থেকে দশ বছর আগে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে। প্রকাশের পরই মডেলটি নিয়ে হইচই পড়ে যায় সর্বএ। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে সকল সমস্যা তৈরী হচ্ছে, তার সমাধানের জন্য একটি কার্যকর প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে এই মডেলটিতে।

বাংলাদেশ যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার, সেহেতু ড. ইমরানের আবিস্কৃত এই মডেল দেশব্যাপীও খুব আলোড়ন তোলে। সবাই এখন আশা করছেন এই মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ঝুকি তৈরী হয়েছে তা পুরোপুরি কেটে যাবে, এবং দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের জোয়ার বইবে।

দক্ষিণবঙ্গের যে সকল নদ-নদীতে লবণাক্ততার কারণে ফসলহানি হচ্ছে, তারও অবসান হবে। ফলে উপকৃত হবে কোটি কোটি মানুষ।

ড. ইমরানের এটাই প্রথম প্রকল্প নয়। বাংলাদেশে তার খ্যাতি মুলত ছড়িয়ে পড়ে আজ থেকে বিশ বছর আগে যখন সবেমাএ তিনি পিএইচডি শেষ করেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার মেধা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাকে বিশেষ সম্মামনা পদক প্রদান করে এবং সেই সাথে তাকে একটি রিসার্চ সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়।

পিএইচডি করার সময়ই তিনি সেই দেশের একাধিক সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন পরামর্শ দিয়েছিলেন যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। ফলে তার পাশ করার আগেই তিনি আন্তর্জাতিক নীতি পরামর্শক হিসাবে সেখানকার সরকারি মহলে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

তার এই সাফল্যের খবর দেশের মানুষের জানতে খুব একটা দেরি হয়নি। তিনি তার এই সাফল্যের কথা তার এক সাংবাদিক বন্ধুকে বলেন এবং তাকে অনুরোধ করেন তার সাফল্য নিয়ে তিনি যেন একটি প্রতিবেদন তার পত্রিকাতে প্রকাশ করেন।

তার সাংবাদিক বন্ধুটি দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হওয়ার কারণে তার এই সাফল্য নিয়ে পত্রিকাটি একটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে এর কিছুদিন পর। এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পরই তিনি হয়ে ওঠেন মিডিয়ার প্রিয় মুখ। দেশে আসলেই তাকে নিয়ে টিভিতে প্রোগ্রাম হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বক্তব্য দেয়ার জন্য।

ইতিমধ্যেই তার অসংখ্য গবেষণা পেপার প্রকাশিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত জার্নালে। বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের অধীনে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তাই বিগত বিশ বছরে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারে তিনি পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন বেশ অনেকদিন হল। বর্তমান মডেলটি প্রকাশ হওয়ার কিছুদিন আগ থেকেই তিনি বর্তমান সরকারি দলের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেন এক বন্ধুর সূএ ধরে। অবশেষে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সুনজরে আসতে সমর্থ হন এবং পরিবেশ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ পান। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন বিষয় এবং যেহেতু এই বিষয়ে বাংলাদেশে দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে, সেহেতু সুদর্শন, স্মার্ট, এবং প্রচারপ্রিয় ড. ইমরান এখন বাংলাদেশে তার সাবজেক্টে একজন অথরিটি।

পেপারটি হাতে নিয়ে সোফাতে নিজের শরীরকে কিছুটা এলিয়ে দিলেন ড. ইমরান। টিভিতে গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এখন দেখানো হচ্ছে একটি টক শো। তিনি অপেক্ষা করছেন রাত একটা'র খবর দেখার জন্য। সেখানে তার ইন্টারভিউ দেখানো হবে। সেইসাথে দেখানো হবে সর্বমহলের প্রতিক্রিয়া। সকলেই ড. ইমরানের মডেলের প্রশংসা করবেন।

তার এই ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখে যে কেউই এখন বলবে ড. ইমরান এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের একজন।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

না।

কারণ ড. ইমরান কিছুটা হলেও চিন্তিত। তার চিন্তা তার মডেল নিয়েই। এই মডেলটি তিনি যখন প্রথম প্রকাশ করেছিলেন তখন তিনি নিজেও এটি শতভাগ বিশ্বাস করতেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার এই মডেলটি বাস্তবায়িত হলে সত্যি সত্যি সমাজ উপকৃত হবে। তাই তার এই মডেলের গুণাগুণ তিনি বলেছেন অনেকটা উচ্চকণ্ঠে, দৃঢ়তার সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে।

বাংলাদেশ সরকার যখন এই মডেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে, তখন তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু একদিন রাত বারোটার সময়, যখন তিনি এক মনে একটি পেপার লিখছিলেন, তখন হঠাৎই তার মাথায় আসে এই মডেলে এক বিরাট দুর্বলতা আছে। অনেক বড় দুর্বলতা।

এই দুর্বলতা আবিস্কার করে তিনি রীতিমতো ঘামতে লাগলেন। টিস্যু দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এটা এমনই এক দুর্বলতা যার কারণে পুরো মডেলটাই ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে যাবে। আবার এই দুর্বলতা কাটানোরও কোন উপায় তিনি বের করতে পারলেন না। আসলে যে তত্ত্বকে ঠিক মনে করে এই মডেলটি তিনি সাজিয়েছেন, সেই তত্ত্বেই গলদ আছে। বিরাট গলদ।

এই গলদের কারণে ড. ইমরান বুঝতে পারলেন এই প্রকল্পটি প্রথম দিকে ভাল কাজ করলেও আস্তে আস্তে এর প্রভাব কমে যাবে। ফলে বছর পাঁচেকের মধ্যেই এই প্রকল্পটির গুণাগুণ অনেকাংশেই লোপ পাবে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুকি মোকাবেলায় যে সকল ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রথমদিকে দৃশ্যমান হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই

তা আবার আগের যায়গায় ফিরে আসবে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সকল ঝুকি কমানোর প্রস্তাব এই মডেলে করা হয়েছে, তা না কমে বরং আরো বেড়ে যেতে পারে।

এখন তিনি কি করবেন? তিনি কি এই দুর্বলতা প্রকাশ করবেন?

নাকি প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন এই প্রকল্প বাতিল করে দিতে?

তিনি প্রায় শতভাগ নিশ্চিত এই দুর্বলতা দেশের কেউ ধরতে পারবে না। কারণ তার সাথে আরো যে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন তারা কেউই সেই মানের নন যে এই দুর্বলতা ধরতে পারেন। আর বিদেশে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা সকলেই তার পূর্বপরিচিত। তারা এখনো এই বিষয়টি নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন তাকে করেননি। তার মানে তাদেরও এই ব্যাপারটি নজরে পড়েনি।

তাহলে তিনি এখন কি করবেন? তিনি যদি এখন এই দুর্বলতা সবার কাছে প্রকাশ করেন তাহলে কি হবে?

প্রকাশ করলে আর কি হবে। তাকে নিয়ে সর্বএ ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে। আগে যারা তাকে সম্মান দেখাতো, তারাই তাকে নিয়ে ব্যঙ্গা করবে। যে সকল সাংবাদিকরা তাকে দেখে আগে ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগতো, তারাই তখন মুখ টিপে হাসবে। তারা বলবে, কেন ড. ইমরান আগেই এই ভুল স্বীকার করলেন না। এখন তো প্রকল্পের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়ে গেছে। বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়ে গেছে। তাই এতোগুলো কাজ কেন খামাখাই করা হল। সেই সাথে যে সকল ব্যক্তি তাকে হিংসা করেন, তারা সরব হবেন বিভিন্ন টক শো গুলোতে। তারা বিজ্ঞের মত বলবেন, তারা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এমন একটা কিছু হবে।

এখন প্রধানমন্ত্রী যদি ড. ইমরানের মুখেই শোনেন যে এই প্রকল্প বাতিল করে দিতে হবে, তাহলে তিনি চাকুরিও হারাতে পারেন। সেই সাথে হারাতে পারেন একটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থায় সম্প্রতি তিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পেয়েছেন, সেই সম্মানজনক পদটিও। হারিয়ে যাবে তার দীর্ঘদিনের সুনামও।

এই সব চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে ড. ইমরানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন তিনি এই দুর্বলতার কথা কাউকেই বলবেন না। কাউকে না। প্রকল্প যদি সময়মতো বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে আগামী প্রায় পনের বছরের জন্য তিনি নিশ্চিন্ত। তবে সমস্যা শুরু হবে তার পর থেকে।

তবে ততোদিনে তিনি আর দেশে থাকবেন না। আশা করা যায়, তখন নতুন দল ক্ষমতায় আসবে। তাই তাদের সময়ে যদি এই প্রকল্পের প্রভাব কমতে থাকে, তাহলে দোষ দেয়া যাবে নতুন দলটির মন্ত্রী-মিনিস্টারদের। বলা যাবে, তাদের দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণেই প্রকল্পটি ঠিকমতো কাজ করছে না। মানুষও তার কথা বিশ্বাস করবে। কারণ একদিকে তিনি তার সাবজেক্টে একজন অথরিটি। আবার অন্যদিকে মানুষ বলবে আগের সরকারের আমলে তো এই প্রকল্প ঠিকই কাজ করেছে। তাহলে এখন কাজ করছে না কেন?

সেইসাথে তিনি তার মিডিয়া কানেকশনও কাজে লাগাবেন। মিডিয়ার লোকরা নিশ্চয়ই তাকেই সাপোর্ট করবে।

সুতরাং তার আসলে কোন ভয় নেই। তার প্রকল্পের এই দুর্বলতার কথা তিনি ছাড়া আর কেউই জানবে না।

"তোমার কি হল? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?", স্ত্রী জুলির প্রশ্নে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে আসলেন ড. ইমরান।

"না কিছু না। এই তো একটু ভাবছিলাম।", বললেন ড. ইমরান।

"কি নিয়ে ভাবছিলে?"

"এই তো তেমন কিছু না।"

"ডিনার তো খেয়েছ অনেক আগে। এখন কিছু খাবে? কিছু দেব?", স্নেহমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জুলি।

"ড্রিংকস দাও।"

"কি দেব?", জুলির প্রশ্ন।

"ওমম...রেড ওয়াইনই দাও।", শান্ত কণ্ঠে বললেন ড. ইমরান।

সত্যি সত্যি আর কেউই জানল না স্বপ্নের প্রকল্পের এই দুর্বলতার কথা।

ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ

এখন পাঠকদের সনাতন ধারণা অনুযায়ী যদি টাকার লেনদেনের পরিমাণকে দুর্নীতির মাত্রার নিয়ামক হিসাবে ধরা হয়, তাহলে আমরা দেখব এখানে যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার অন্তত তিনটি ঘটনাতে কোন প্রকার টাকা কিংবা ঘুষের সরাসরি লেনদেন হয়নি। ঘটনা তিনটি হল জমি দখলের ঘটনা, ড. ইমরানের ভুল তত্ত্ব, এবং মি. সিদ্দিকুর রহমানের ঘটনা।

কিন্তু তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে এই তিনটি ঘটনার কোনটাই দুর্নীতি নয়?

টাকার সরাসরি লেনদেনকে যদি আমরা দুর্নীতির নিয়ামক ধরি, তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে ড. ইমরানের ঘটনাটিতে কোন দুর্নীতি হয়নি। আবার মি. সিদ্দিকুর রহমান কোন টাকার লেনদেন না করলেও সমাজে তার একটা পরিচিতি হয়ে গেছে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী হিসাবে। তাই কোন প্রকার টাকার লেনদেন না করে একজন ব্যক্তি সৎ হিসাবে থেকে যাচ্ছেন, আর অপরজন দুর্নীতিবাজ হয়ে যাচ্ছেন। তাই এখানে তো টাকার লেনদেনের কোন প্রভাব নেই।

আবার জমি দখলের যে ঘটনাটি বলা হয়েছে, তা সমাজে পরিচিতি পেয়েছে একটি দুর্ঘটনা হিসাবে। কোন দুর্নীতি হিসাবে নয়। তাহলে প্রশ্ন হল এখানে কি কোন দুর্নীতি হয়নি?

আমার এই উদাহরণগুলি পড়ার পর আপনারাও নিশ্চয়ই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণে টাকার সরাসরি লেনদেন একটি প্রধান নিয়ামক হতে পারে না।

আবার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমরা যদি এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে টাকার অংকে রাষ্ট্র কিংবা জনগণের ক্ষতিকে দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণের একটি নিয়ামক হিসাবে ধরে নেই, তাহলে আমরা যে ক্রম পাব, তা নিম্নরূপঃ

১.কাল্পনিক ঘটনা ৪ (ড. ইমরানের দুর্নীতি) – ক্ষতি প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা
২.কাল্পনিক ঘটনা ৩ (মি. সিদ্দিকুর রহমানের দুর্নীতি) – ক্ষতি প্রায় ২০০ কোটি টাকা
৩.কাল্পনিক ঘটনা ১ (মি. বেলায়েত হোসেনের দুর্নীতি) – ক্ষতি প্রায় ২০ কোটি টাকা
৪.কাল্পনিক ঘটনা ২ (মি. আব্দুস সোবহানের দুর্নীতি) – ক্ষতি প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা

কাল্পনিক ঘটনা ৪ এ ড. ইমরানের ভুল তত্ত্বের কারণে রাষ্ট্রের প্রাথমিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। তাই টাকার অংকে ক্ষতির হিসাবে এই দুর্নীতি সবচেয়ে বড় দুর্নীতি।

কাল্পনিক ঘটনা ৩ এ মি. সিদ্দিকুর রহমানের স্বজনপ্রীতির ঘটনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ার কারণে জনমনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে এখানে দুর্নীতি হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকার। তাই এটি দ্বিতীয় স্থানে।

কাল্পনিক ঘটনা ১ এ মি. বেলায়েত হোসেন সান্টু যে জমির জন্য বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছেন, তার বাজার মূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। তাই টাকার অংকের বিচারে এই দুর্নীতি তৃতীয়।

সর্বশেষে স্থান পেয়েছে মি. আব্দুস সোবহানের দুর্নীতি, কারণ এখানে টাকার সম্ভাব্য লেনদেন হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ডলার বা প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা।

কিন্তু আমার মতে দুর্নীতির মাত্রার বিচারে এই ঘটনাগুলির ক্রম হওয়া উচিৎ নিম্নরূপঃ

১. কাল্পনিক ঘটনা ১ (মি. বেলায়েত হোসেন সান্টুর দুর্নীতি)
২. কাল্পনিক ঘটনা ৪ (ড. ইমরানের দুর্নীতি)
৩. কাল্পনিক ঘটনা ২ (মি. আব্দুস সোবহানের দুর্নীতি)

আমি এই ক্রমতে মি. সিদ্দিকুর রহমানের দুর্নীতি আনিনি বিশেষ কারণে। এই কারণটি আমি পরে বলছি।

আমার মতে, এই চারটি ঘটনার মধ্যে মি. বেলায়েত হোসেন সান্টু সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি করেছেন যদিও তার দখল করা জমির মূল্য মাত্র ২০ কোটি টাকা। এর কারণ এই ঘটনাটি ঘটাতে গিয়ে এক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সেইসাথে একটি পরিবার হারিয়েছে দুই শিশু সন্তানকে যার ক্ষতি কোনভাবেই মেটানো সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে কোন দুর্ঘটনায় ধনীরা মারা গেলে তা নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়। কিন্তু দরিদ্র মানুষরা যখন লঞ্চ দুর্ঘটনা, আগুন কিংবা রোড এক্সিডেন্টে মারা যায়, তখন তা কারোরই নজরে পড়েনা। ফলে এই ঘটনাগুলো দিনের পর দিন ঘটতেই থাকে। অথচ মানুষের জীবনের মূল্য সকল ক্ষেত্রেই সমান। এখানে মৃত ব্যক্তির ধন কোন বিবেচ্য বিষয় নয়।

তাই নৈতিকতার বিচারে কাল্পনিক ঘটনা ১ ই আমার মতে সবচেয়ে বেশী জঘন্য।

আমার ক্রমতে দ্বিতীয় স্থানে আছে ড. ইমরানের দুর্নীতি। আমার মতে তিনি চাইলেই পারতেন রাষ্ট্রকে এক বিরাট আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রের এক বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখানে তিনি যে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, তাকে বলা যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বা ইন্টেলেকচুয়্যাল করাপশন (Intellectual Corruption)। তবে এখানে রাষ্ট্রের ক্ষতি হলেও এই দুর্নীতির জন্য কোন মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়নি। তাই আমি এই ঘটনাটিকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছি।

আমার বিচারে তৃতীয় মাএার দুর্নীতি হয়েছে মি. আব্দুস সোবহানের ঘটনাটিতে। এখানে জোর করে ঘুষের মত সাহায্য দাবী করা হয়েছে যার পরিমাণ ১ লক্ষ ডলার বা ৭০ লক্ষ টাকা। এখানে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে টাকায় নয়, বরং ইমেজের মাধ্যমে। এই দুর্নীতির মাধ্যমে একজন বিদেশীর কাছে বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী বিবেচিত হয়েছেন একজন দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী হিসাবে। তাই এই বিদেশীর কাছে কোন জরিপদল গেলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা হবে নেতিবাচক। ফলে সেই জরিপে বাংলাদেশ কম নম্বর পাবে।

আমি মি. সিদ্দিকুর রহমানের ২০০ কোটি টাকার ক্রেন কেনার ঘটনাকে এই ক্রমের মধ্যে স্থান দিইনি কারণ আমি মনে করি এখানে কোন দুর্নীতি হয়নি যদিও এই ঘটনাটি পত্রিকাতে পড়ে যে কোন পাঠকের মনে হতে পারে এই ঘটনাতে মি. সিদ্দিকুর রহমান তার শালার ব্যবসার মাধ্যমে বিরাট অংকের দুর্নীতি করেছেন। আমার মতে এখানে বরং দুর্নীতি করেছেন সেই পত্রিকার সম্পাদক যিনি মি. সিদ্দিকুর রহমানকে সমাজে দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিত্রিত করার একটি অপচেষ্টা করেছেন।

আমি মনে করি, এই ক্রেন কেনার ঘটনাতে মি. সিদ্দিকুর রহমান তার ঐচ্ছিক ক্ষমতার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অপব্যবহার করেননি। তিনি কিছুটা স্বজনপ্রীতি করেছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত কিছুই করেননি। তিনি যদি তার শালাকে কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেয়ার জন্য সরকারি অফিসারদের চাপ দিতেন তাহলে তা হতো ক্ষমতার অপব্যবহার। কিন্তু তা হয়নি।

আমাদের দেশে সাধারণত যে সকল স্বজনপ্রীতির ঘটনা ঘটে তা অধিকাংশ ক্ষেএেই নগ্ন স্বজনপ্রীতি। অধিকাংশ ক্ষেএে দেখা যায়, ক্ষমতাধরদের আত্মীয়, বন্ধু বা কাছের লোক হওয়া ছাড়া এই সকল স্বজনদের আর কোন যোগ্যতাই নেই। এই কারণে এই সকল অযোগ্য স্বজনরা এমন কোম্পানির কাজ পান যাদের স্বাভাবিক নিয়মে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে এই সকল কোম্পানি যখন টেন্ডারে অংশ নেয়, তখন তারা কাজ

পাওয়ার জন্য অবৈধ পথের আশ্রয় নেয়। ফলে ক্ষমতাধররা যেমন স্বজনপ্রীতিতে জড়িয়ে যান, তেমনি রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয় অনেক।

আবার এমনও দেখা যায় কোন এক ক্ষমতাধরের বিশেষ স্বজন সবাইকে টেক্কা দিয়ে সকল কাজই বাগিয়ে নিচ্ছেন। হোটেল বানালেও সেই স্বজন, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বানালেও একই স্বজন। ফলে যখনই কোন টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে, তখনই সেই স্বজনকে দেখা যাচ্ছে। এমন স্বজনের জ্বালায় কাজ হারাচ্ছেন অন্যান্য সকল কন্ট্রাক্টররা। তাই একজন মাত্র স্বজনের টাকার লোভ মেটাতে গিয়ে দেশের যেমন কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি সেই বিশেষ ক্ষমতাধর ব্যক্তিও বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছেন।

কোন একটি পরিবারের সদস্য যদি ক্ষমতা পান, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি মাত্রার স্বজনপ্রীতি হবেই। বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা বরং আরো বেশি, কারণ বাংলাদেশ একটি দরিদ্র জনবহুল দেশ। এখানে ক্ষমতার স্বাদ পান খুবই কম সংখ্যক মানুষ। তাই এই সকল ক্ষমতাধররা যখন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন, তখন তাদের উপর এক প্রকার সামাজিক চাপের সৃষ্টি হয়। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু এই সকল চাপের কারণে ক্ষমতাধররা আপোস করতে বাধ্য হন তাদের সমাজে টিকে থাকার জন্যই। তারা যদি তা না করেন, তাহলে পরবর্তীতে তাদেরকেই সমাজহীন হয়ে থাকতে হবে।

তাই বাংলাদেশের বাস্তবতায় একটি মাত্রার স্বজনপ্রীতিকে দুর্নীতি বলার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই স্বজনপ্রীতি যেন নগ্ন স্বজনপ্রীতি না হয়। এখানে কোন স্বজনপ্রীতি সীমার অতিরিক্ত এবং কোনটি নয়, তা বোঝার জন্য মি. সিদ্দিকুর রহমানের কাল্পনিক ঘটনাটিই যথেষ্ট।

সূচকের বাইরের দুর্নীতি

এখানে যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে ড. ইমরানের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির ঘটনাটি বর্তমানে প্রচলিত কোন প্রকার সূচকেই ধরা পড়বে না। কারণ বর্তমানে যে সকল সূচক প্রচলিত রয়েছে, তা তৈরী করা হয় বিভিন্ন জরিপকে ব্যবহার করে এবং এই সকল জরিপে মূলত টাকার সরাসরি লেনদেনকেই দুর্নীতির অন্যতম নিয়ামক হিসাবে ধরা হয়।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, ড. ইমরান যে দুর্নীতিটি করেছেন তা টাকার বিচারেই হোক কিংবা রাষ্ট্রের ক্ষতির বিচারেই হোক, কোনভাবেই এই দুর্নীতিকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

সবচেয়ে বড় দুর্নীতি

এখানে একটি কথা বলা দরকার। উপরের যে চারটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন মাত্রার দুর্নীতির সম্ভাব্য উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তবে সবচেয়ে বড় মাত্রার দুর্নীতিরই কোন উদাহরণ দেয়া হয়নি। কারণ আমি মনে করি সবচেয়ে বড় মাত্রার যে দুর্নীতি রয়েছে তাকে কোন প্রকার কাল্পনিক ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আমার মতে সবচেয়ে বড় মাত্রার দুর্নীতি করেন সেই ব্যক্তি যিনি বিদেশীদের অর্থ এবং খ্যাতির লোভে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে কাজ করেন। আমার মতে এই সকল 'দেশবিরোধী'রাই দেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ। এরা শুধু দুর্নীতিবাজই নয়, এরা রাষ্ট্রদ্রোহীও। এরা দেশে থাকে, কিন্তু চলে বিদেশীদের প্ররোচনায়। এরা মুখে বলে দেশের কথা, কিন্তু এদের মনে থাকে বিদেশ।

আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের দেশে ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতিবিরোধী এবং সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান হলেও 'দেশবিরোধী' নির্মূল অভিযান কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি। তাদেরকে প্রকাশ্যে চিহ্নিতও করা হয়নি।

কিন্তু এরা যদি এভাবে বার বার পার পেয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে দেশের কোন দুর্বল মুহূর্তে এই দেশবিরোধীরা আবারো তাদের স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হবে। তাই আমার মতে এদেরকে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত। শুধু তাই নয়। এই শাস্তির কাহিনী এবং প্রেক্ষাপট আমাদের স্কুলগুলোর টেক্সট বইয়েও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে আগামী ৫০০ বছর পরও আমাদের শিশুরা যেন জানতে পারে অতীতে দেশবিরোধীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

একটি গুরুত্বপুর্ণ কথা

রিপোর্টটির এই অংশে বিভিন্ন মাত্রার দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হলেও আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্রদ্রোহীতা ব্যতীত সকল মাত্রার দুর্নীতির শাস্তি একই রকম হওয়া উচিৎ। এটা যদি না হয় তাহলে মানুষ বেশি মাত্রার দুর্নীতিকে বাদ দিয়ে কম মাত্রার দুর্নীতি করার প্রতি বেশী উৎসাহিত হবে। ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ বেশি মাত্রার দুর্নীতি করার দিকে এগিয়ে যাবে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার।

মানুষ দুর্নীতি শুরু করে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তা শুরু হয় কম মাত্রার দুর্নীতি দিয়েই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা লোভের দুর্নীতিতে তথা বেশি মাত্রার দুর্নীতিতে পরিণত হয়। আর এই সর্বগ্রাসী লোভের কারণেই মানুষ তার নীতি নৈতিকতা ভুলে গিয়ে এমন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে যা যে কোন মানদন্ডেই অগ্রহণযোগ্য এবং অনাকাঙ্খিত।

২.২. সুচকের বাইরের দুর্নীতি

এরই মধ্যে বলা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বা Intellectual Corruption কোন প্রকার সুচকে প্রতিফলিত হয় না, অথচ অন্যান্য সকল প্রকার দুর্নীতির মত এই সকল উচ্চ মাত্রার দুর্নীতি নিয়েও আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত কারণ এই সকল দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষের পকেট থেকে টাকা চলে যায় কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না।

বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতিগুলি করেন মূলত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষেরা যারা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। এই সকল বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীরা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য সমাজ এই সকল বিশেষজ্ঞদের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অডিটর, সাংবাদিক, গবেষক প্রর্ভৃতি।

আমাদের দেশে উল্লিখিত পেশাজীবীরা বিভিন্নভাবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা কখনোই জোরেসোরে বলা হচ্ছে না। যেমন, শিক্ষকদের কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে আমরা দেখব আমাদের সমাজে এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা কোন প্রকার ক্লাস না নিয়ে রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ তাদের কাছে মুখ্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য যেনতেনভাবে রাজনীতিবিদদের নজর কেড়ে একটি পদ দখল করা।

আবার অনেক শিক্ষক আছেন যারা হয়তো ক্লাস নিচ্ছেন কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করছেন যা কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যেহেতু তাদের পরীক্ষার নম্বরের ব্যাপারে এই সকল শিক্ষকদের কাছে জিম্মি, সেহেতু তারা এই ধরণের ক্ষমতার অপব্যবহারের কোন প্রকার প্রতিবাদ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

শিক্ষকদের অবহেলার কারণে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন জটে আটকে রয়েছেন এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। আমি নিজেও এর শিকার। আমার চার বছরের অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে সময় লেগেছে প্রায় ছয় বছর। অথচ এই সময়কালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় যে কয়দিন বন্ধ ছিল, তার চেয়েও বেশি সময় নষ্ট হয়েছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে[১]।

[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'বিচিত্রায়' খুব সম্ভবত ১৯৯৫ সালে। রচনাটির শিরোনাম আমার এখন আর মনে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এই রচনাটি আমি লিখেছিলাম 'প্রলয় চৌধুরী' ছদ্মনামে। কারণ আমার ভয় ছিল আমার শিক্ষকেরা যদি জানতে পারেন এই রচনাটি আমি লিখেছি, তাহলে তারা আমাকে পরীক্ষায় নম্বর কম দিতে পারেন। কোন দেশী পত্রিকায় এটাই ছিল আমার প্রথম কোন প্রকাশিত রচনা।

একই কথা ডাক্তারদের বেলাতেও সত্যি। অভিযোগ রয়েছে আমাদের সমাজে এমন ডাক্তার আছেন যারা বিভিন্ন প্রকার ডায়গনসিস সেন্টারের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকেন এবং রোগী পেলে তারা একটি টেস্টের বদলে একাধিক টেস্ট করাতে রোগী এবং তার স্বজনদেরকে বাধ্য করেন। এখানে রোগী বা তার স্বজনরা অসহায়। কারণ তাদের পক্ষে ডাক্তারের এই পরামর্শ কোনভাবে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়।

আবার অভিযোগ রয়েছে এমন অনেক প্রসূতি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা রোগীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মাত্র কয়েক হাজার টাকার লোভে নরমাল ডেলিভারী না করিয়ে সিজারিয়ান অপারেশন করান। এখানেও রোগীদের প্রতিবাদ করার কোন প্রকার সুযোগ নেই। কারণ এমন একটি সময়ে এই অপারেশনের কথাটি বলা হয় যখন রোগীর আর করার কিছুই থাকে না। অনেক সময় রোগী বুঝতেও পারেন না যে তাকে ভুল বুঝিয়ে বেশী টাকা আদায় করে নেয়া হচ্ছে।

এক শ্রেণীর ডাক্তারদের দুর্নীতির অসহায় শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশের শ্রমিকরাও। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য দরিদ্র শ্রমিক বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। ভিসা পাওয়ার পর এই সকল শ্রমিকদের প্রত্যেককেই মেডিকেল টেস্ট করাতে হয় কিছু নির্দিষ্ট মেডিকেল সেন্টারে। যেহেতু শ্রমিকদেরকে এই সেন্টারগুলিতেই টেস্ট করাতে হবে, সেহেতু এই সেন্টারগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ডাক্তাররা প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেন।

তাদের সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে গিয়ে এই ধরণের ডাক্তাররা অনেক সময় একটি টেস্টের মনগড়া রিপোর্ট দিয়ে অসহায় শ্রমিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা দাবী করেন যাতে এই টেস্টের ফলাফল পরিবর্তন করানো যায়। এই ধরণের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে যেখানে শ্রমিকদেরকে বলা হয়েছে তার অমুক রোগ রয়েছে, কিন্তু বাইরের সেন্টারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার শরীরে এই রোগের কোন অস্তিত্ব নেই।

আবার বিদেশগামী যাত্রী যদি একজন স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য হন, তাহলে এই ধরণের ডাক্তারদের আবার পোয়াবারো। তখন তাদের টাকার অঙ্কটাও আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে যেহেতু ডাক্তারদের জবাবদিহিতার কোন প্রকার বলিষ্ঠ কাঠামো এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি এবং যেহেতু দেশে মোট জনগোষ্ঠীর পরিমাণের তুলনায় ডাক্তারদের সংখ্যা খুবই কম, সেহেতু ডাক্তাররা বাংলাদেশে প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেন যার অপব্যবহার তারা চাইলেই করতে পারেন।

বর্তমান বিশ্বে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির এক একটি আখড়া। এই স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে প্রতিদিন শত শত কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। যারা এই লেনদেন করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তারা সকলেই বিশেষায়িত দক্ষতার অধিকারী। এই সকল লেনদেনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য। এই তথ্যগুলো আবার সবসময় সঠিকভাবে প্রচারিত হয়না। তাই এই ধরণের সংবেদনশীল তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনেকেই টাকার পাহাড় গড়ছেন।

আবার অনেক সময় কোন প্রকার তথ্য এবং কারণ ছাড়াই একটি শেয়ারের দাম কমে বা বাড়ে। এই ধরণের প্রবণতাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এক বা একাধিক বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটই ঠিক করে তারা কোন শেয়ারের দাম বাড়াবে, কোনটির কমাবে। তাই এই ধরণের অসাধু সিন্ডিকেটের অপতৎপরতায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের টাকা চলে যায় বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের হাতে।

বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে এই ধরণের দুর্নীতির সম্ভাবনা বরং আরো বেশি। কারণ এখানকার স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে লেনদেনকৃত শেয়ারের পরিমাণ কম হওয়াতে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। তাই এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চাইলেই কৃত্রিমভাবে কোন একটি শেয়ারের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নিতে পারেন।

এই ধরণের কৃত্রিম লেনদেন এবং অনিয়ম যাতে না ঘটে, তা তদারকি করার জন্য রয়েছে Security and Exchange Commission বা (SEC) । এই সংস্থার কর্মকর্তারা সবসময়ই দৃষ্টি রাখেন বাজারের গতি প্রকৃতির দিকে। কোন বাজার প্লেয়ার যদি অনিয়ম করেন, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেয়ারও এখতিয়ার রয়েছে এই সংস্থার কর্মকর্তাদের।

এম এম মডেলের মাপক অনুযায়ী এই কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অনেক কম, কিন্তু যেহেতু একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকার প্রশ্নবিদ্ধ লেনদেন ধরার ক্ষমতা তাদের রয়েছে, সেহেতু এই কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। তাই দুর্নীতির সম্ভাবনাও বেশি। এই সম্ভাবনা কমানোর জন্য সরকারের উচিত তাদের ক্ষমতার সাথে বেতন কাঠামো এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা।

দুর্নীতি রয়েছে গবেষক কিংবা বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও। এই পেপারে ড. ইমরানের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের যে উদাহরণটি দেয়া হয়েছে তা অনেকে নিতান্ত কাল্পনিক মনে করলেও এই ধরণের ঘটনা বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ উন্নয়ন, নদী শাসন, যানজট নিরসন, বিদ্যুতায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বিগত দশকগুলিতে হাজারো প্রকল্প নেয়া হয়েছে এবং খরচ করা হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এই সকল প্রকল্পের অনেকগুলি পুরোপুরি দেশীয় অর্থায়নে হয়েছে, আবার অনেক প্রকল্প হয়েছে বিদেশী অর্থায়নে। কিন্তু অতীতের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং সফলতার হার যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই ধরণের অনেক প্রকল্পই সফল হয়েছে, আবার অনেক প্রকল্পই ব্যর্থ হয়েছে। আবার এমনও অনেক প্রকল্প আছে যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সকল প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়।

এখন এই সকল ব্যর্থ প্রকল্পগুলির ব্যর্থতার মূল কারণগুলি যদি একে একে সাজানো যায়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে এই সকল প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য শুধুমাএ আর্থিক দুর্নীতি কিংবা অব্যবস্থাপনাই দায়ী নয়, বরং এর জন্য দায়ী বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতিও। কিন্তু সমস্যা হল এই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি যেহেতু কোন প্রকার সূচকে প্রতিফলিত হয় না, সেহেতু এই সকল দুর্নীতিকে ধরা প্রায় অসম্ভব। কারণ কোন বিশেষজ্ঞকে যদি এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে ধরে নেয়া যায় তিনি তার নিজের দোষ কখনোই স্বীকার করবেন না।

আবার বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের দুর্নীতির অনেক প্রকারভেদ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হল তারা সাধারণত কোন একটি বিষয়ে কখনোই একমত হতে পারেন না। আমার মতে, এটা যে শুধুই বিষয়টি সম্পর্কে ভিন্ন বিশ্বাসের কারণেই হয় তা নয়। বরং এই ধরণের আচরণের পিছনে অনেক সময় সমস্যাটির প্রকৃত সমাধানের চেয়ে ব্যক্তিগত ইগো, পেশাগত হিংসা ও বিদ্বেষ, প্রচারের সুযোগ, রাজনীতি ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে।

আবার অনেক খ্যাতনামা গবেষক রয়েছেন যারা পরামর্শ দেন জনমতের উপর ভিত্তি করে। কোন একটি বিষয়ে জনমত পরিবর্তন হলে তাদেরকেও রাতারাতি ভোল পাল্টাতে দেখা যায়। এখানে প্রকৃত সমাধান বা দেশের স্বার্থ কোন কিছুই মুখ্য নয়। তাদের এই ধরণের আচরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রচারের মাধ্যমে মানুষের হাততালি অর্জনের সুযোগ।

গবেষকরা দেশের সবচেয়ে মেধাবী শ্রেণী। তাই জনমতের উপর নির্ভর না করে তাদেরই বরং উচিত কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি করা।

আমি ড. ইমরানের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির উদাহরণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাটি ব্যবহার করেছি অনেকটা ইচ্ছা করেই। কারণ আমি মনে করি, বাংলাদেশ যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একটি বিরাট ঝুকির মুখোমুখি, সেহেতু এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে অদুর ভবিষ্যতে অনেক প্রকল্প নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে বিদেশীদের অর্থেরও কোন প্রকার অভাব হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু আমরা যদি এই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলিকে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের প্রকল্পের মতো বিচার করি তাহলে আমরা একটি বড় ভুল করব। কারণ দারিদ্র্য বিমোচন, যানজট নিরসন, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যর্থ প্রকল্পগুলির কারণে আমাদের অস্তিত্বের কোন সঙ্কট হয়নি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন বড় প্রকল্প যদি ভবিষ্যতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হওয়া জরুরী।

বুদ্ধিবৃত্তিক পেশাজীবীদের ক্ষমতা

এই ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক পেশাজীবীদের মধ্যে কার ক্ষমতা কতটুকু তারও একটি পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

এম এম মডেল অনুযায়ী যে সকল পেশাজীবীদের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, তাদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। আমরা যদি এখন বিভিন্ন পেশাজীবীদের ক্ষমতা নির্ধারণে এই মাপকটি ব্যবহার করি, তাহলে দেখব পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষকদের ক্ষমতা সবচেয়ে কম। কারণ যে জনগোষ্ঠীর উপর তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, সেই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক কম। এই কারণে শিক্ষকরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন মুলত তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর।

এর উপরের স্থানে রয়েছেন প্রকৌশলীরা। যে জনগোষ্ঠীর উপর প্রকৌশলীরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন, তাদের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু তারপরও প্রকৌশলীদের দুর্নীতির সুযোগ অনেক বেশি কারণ বেশি বাজেট বরাদ্দের কারণে তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগও বেশি।

ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগের দিক থেকে ডাক্তারদের অবস্থান আরো উপরে কারণ দেশের সব মানুষই তাদের চিকিৎসা সেবার জন্য ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীল। ফলে তারা চাইলেই তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন।

বাংলাদেশে ডাক্তারদের ক্ষমতা অন্যান্য দেশের ডাক্তারদের তুলনায় অনেক বেশি কারণ এখানে বিশাল জনসংখ্যার বিপরীতে ডাক্তারদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ডাক্তারদের মধ্যে আবার বিশেষায়িত বা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের সংখ্যা এতোটাই কম যে তাদের ক্ষমতা প্রায় আকাশচুম্বি। এই কারণে বাংলাদেশে ডাক্তারী পেশা নিয়ে নানাবিধ অভিযোগ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই মাপক অনুযায়ী গবেষকদের ক্ষমতা অনেক কম হলেও সরকারের শীর্ষস্থানীয় মহল যদি কোন গবেষকের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তাহলে সেই গবেষকের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। কারণ সরকারের নির্ভরতার কারণে সেই গবেষক পরোক্ষভাবে সারা দেশের মানুষের জীবন যাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। তাই এর সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এখানে অনেকে বলতে পারেন, একজন গবেষক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল পরামর্শ দেন কিংবা সঠিক পরামর্শটি না দিয়ে চুপ থাকেন, তাহলে তো সেই ভুল ধরার জন্য আরো গবেষক রয়েছেন।

হ্যা। এটা ঠিক।

তবে সরকার যদি কোন বিশেষ গবেষকের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে অনেক সময় সেই খ্যাতনামা গবেষকের ব্র্যান্ড ইমেজের কারণে অন্যান্য গবেষকরা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগতে পারেন। তাই সেই বিখ্যাত গবেষক যদি কোন ভুল পরামর্শ দেন কিংবা কোন সঠিক দিকনির্দেশনার ব্যাপারে কোন কথা না বলেন, তাহলে অন্যান্য গবেষক সেই ব্যাপারে উচ্চবাচ্য নাও করতে পারেন। তাই শুধুমাএ গুটিকয়েক মানুষের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে সকলের অজান্তেই সারা দেশ চলে যেতে পারে ভুল পথে।

এই মাপক অনুযায়ী অডিটরদের ক্ষমতা ব্যাপক। কারণ তারা কোন একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব পএ দেখে যে মতামত দেন, সেই মতামতের উপর নির্ভর করে সরকার যেমন অনেক সিদ্ধান্ত নেয়, তেমনি অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তও এই মতামতের উপর নির্ভরশীল। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক সবসময়ই চাইবেন অডিটরদেরকে প্রভাবিত করে মতামতটি যেন তার অনুকূলে হয়, সেই চেষ্টা করতে।

তবে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অডিটরদের চেয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলির অডিটরদের ক্ষমতা অনেক বেশি। কারণ তাদের মতামতের উপর নির্ভর করে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত।

এই মাপক অনুযায়ী মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কারণ বর্তমান যুগে আমাদের সকলেরই মিডিয়ার উপর নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। তথ্য, স্বীকৃতি, ব্যবসায়িক প্রচার, এবং সুনামের জন্য এখন গবেষক, ডাক্তার, অডিটরসহ সকল পেশাজীবীকেই মিডিয়ার উপর কোন না কোনভাবে নির্ভর করতে হয়। যেহেতু এম এম মডেলের ক্ষমতার মাপক অনুযায়ী এই পেশাজীবীদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, সেহেতু এই ক্ষমতাধর পেশাজীবীদের দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়ে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সবচেয়ে ক্ষমতাধর পেশাজীবী

এম এম মডেলের ক্ষমতার মাপক অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ মিডিয়া কর্মীদের। কারণ বর্তমানে ফ্রি মিডিয়ার যুগে সকলেই তথ্যের জন্য মিডিয়ার উপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল। সেইসাথে সামাজিক স্বীকৃতির ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যখন তার প্রাত্যহিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং বাসস্থানের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, তখন সে চায় সামাজিক সম্মান, স্বীকৃতি এবং খ্যাতি। মানুষের এই চাহিদাকে বলা হয় Esteem Needs[২]।

মানুষের এই চাহিদা রয়েছে বলেই ব্যবসায়ীরা একসময় সাংসদ হতে চান। অনেকে চায় পুরস্কার। আবার অনেকে চায় স্টার বা সেলেব্রিটি হতে। বর্তমান যুগে এই চাহিদা মেটানোর একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মিডিয়া। তাই মিডিয়া কর্মীদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছেই।

মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি এখন আর শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বাইরে অন্যান্য অনেক দেশেও। তাই আজকাল সাংবাদিক কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

এখানে কোন মিডিয়ার ক্ষমতার মাত্রা কতটুকু তা সহজেই বের করে ফেলা যায় সেই মিডিয়াটির সার্কুলেশন বা দর্শক সংখ্যা দিয়ে।

[২] এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন **Maslowe's Need Hierarchy.**

আমরা যদি সার্কুলেশন এবং দর্শক সংখ্যা দিয়ে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে একে একে সাজাই তাহলে দেখতে পাব, বাংলাদেশে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথম আলো, যুগান্তর এবং আমাদের সময় উল্লেখযোগ্য। কারণ এই পত্রিকাগুলির পাঠকসংখ্যা অন্যান্য যে কোন পত্রিকার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে এই বিশাল সংখ্যার পাঠকদের উপর এই সকল মিডিয়ার সাংবাদিকদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগও অনেক বেশি।

আবার আমরা যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব এনটিভি এবং চ্যানেল আইয়ের ক্ষমতা অন্যান্য চ্যানেলগুলোর চেয়ে বেশি কারণ তাদের দর্শক সংখ্যাও বেশি। তাই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগও বেশি।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চেয়ে প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি কারণ মানুষ সাধারণত প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পেপারই পড়ে, এবং সেই পেপারের কোন একটি সংবাদ পুরোপুরি ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু অন্যদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্ন।

কারণ এখানে দর্শকের হাতে থাকে রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস। দর্শকরা চাইলেই চট করে অন্য একটি চ্যানেলের সংবাদ দেখে নিয়ে বুঝতে পারবেন কোন চ্যানেলেন দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম। তাই এখানে দর্শকদেরও এক বিরাট ক্ষমতা রয়েছে। দর্শকদের এই বিরাট ক্ষমতার কারণে কোন চ্যানেলই এখন খুব একটা একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে একটি সংবাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সম্ভাবনা প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে ইলেকট্রনিক চ্যানেলগুলির অনেক বেশি।

তবে আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেকে একাধিক সংবাদপত্র পড়ছেন, এবং একটি সংবাদের বিভিন্ন ভার্শন তারা সহজেই যাচাই করতে পারছেন। ফলে প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

তবে ক্ষমতা কমার এই হারের আবার তারতম্য রয়েছে।

যে পাঠক দেশে বসে হার্ডকপি পড়ছেন, সেই পাঠকের পক্ষে সহজে সম্ভব হচ্ছে না কোন একটি সংবাদের সত্যতা যাচাই করা। কারণ তিনি সাধারণত একটি পেপারই পড়ছেন।

কিন্তু এইদিক থেকে বাংলাদেশি প্রবাসী পাঠকরা অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন।

তারা যেহেতু বাংলাদেশি পত্রিকা পড়ার জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু তারা সাধারণত শুধু একটি পেপারই পড়েন না, পড়েন অনেকগুলি। ফলে বাংলাদেশি প্রবাসীরা যতটা সহজে একটি পত্রিকার ভুল ধরতে পারেন, দেশে থাকা কোন নাগরিকের পক্ষে সেই ভুলটি ততটা সহজে ধরা সম্ভব নয়।

অনেকেই বলতে পারেন, ফ্রি মিডিয়ার যুগে যদি অনেক মিডিয়া হাউস তৈরী হয়ে যায়, তাহলে মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ অনেক কমে আসবে।

হ্যা। এই কথাটি আংশিক ঠিক। পুরোপুরি ঠিক নয়।

কারণ আমি মনে করি, মিডিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়লে সংবাদ পরিবেশনায় নিরপেক্ষতার সম্ভাবনা বাড়বে তা সত্যি। কিন্তু তার মানে এই নয় মিডিয়াতে দুর্নীতি কমে আসবে। মিডিয়াতে দুর্নীতি শুধুমাএ প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করেই হয় না, বরং যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় না, সেই সকল সংবাদ নিয়েই বরং দুর্নীতির সুযোগ অনেক বেশি।

এখানে উল্লেখ্য, ‘হলুদ সাংবাদিকতা’ এবং ‘মিডিয়ার দুর্নীতি’ প্রায় সমার্থক হলেও এই দু’য়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। হলুদ সাংবাদিকতা হয় মূলত প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে। আর মিডিয়ার দুর্নীতির হয় প্রধানত অপ্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে।

আমরা এই পেপারের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে অপুর যে উদাহরণটি দিয়েছি, সেখানে দেখা গেছে বস্তি সংক্রান্ত তদন্তটি সে আর করতে পারেনি। এর কারণ পত্রিকাটির সম্পাদক সেকশন এডিটর মি. ইমতিয়াজকে বলে দিয়েছেন অপু যেন এই বিষয়টিতে মনোযোগ না দিয়ে অন্য একটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়।

এই পরিবর্তনটি কেন হল তা অপু জানে না। আমরাও জানি না।

কারণ এখানে পরিস্কার নয়, এই ব্যাপারটিতে পত্রিকার সম্পাদককে কি হুমকি দেয়া হয়েছে, নাকি সম্পাদকের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে জড়িত। অপুকে বলা হয়েছে, সে যদি এই তদন্ত না করে তাহলে তা তার জন্য ভাল হবে। এখানে প্রচ্ছন্ন একটি হুমকির আলামত রয়েছে। কিন্তু সত্যিই হুমকি দেয়া হয়েছে, নাকি অন্য কোন স্বার্থ এখানে জড়িত, তা জানেন একমাএ সম্পাদক। সেকশন এডিটর মি. ইমতিয়াজও খুব সম্ভবত তা জানেন

না। কারণ তাকে যা বলা হয়েছে, তিনি তাই বিশ্বাস করেছেন এবং তিনি অপুকে সেটাই বলেছেন।

তাই কোন একটি পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের সবসময় নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করার অর্থ এই নয় যে সেই মিডিয়াটি কোন দুর্নীতি করছে না। বরং নিরপেক্ষ ইমেজের কারণে এই মিডিয়ার ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ দিন দিন বাড়ছে যার কারণে তারা এমন একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে একটি বিরাটাকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারে যে সংবাদটি হয়তো কখনোই প্রকাশিত হবে না।

বর্তমান যুগে মিডিয়ার প্রভাব

বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্রে মিডিয়া কোন একটি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য প্রচারণার প্রয়োজন রয়েছে। আর এই প্রচারণার একটি বড় মাধ্যম হল প্রিন্ট এবং ইলেকট্রোনিক মিডিয়া।

তাই আমরা যদি বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো টেকশই করতে চাই, সাধারণ মানুষকে যদি আরো ক্ষমতাবান করতে চাই, তাহলে বর্তমান মিডিয়া জগতের সাথে রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পারস্পরিক এই সম্পর্ক আমাদেরকে বিষদভাবে জানতে হবে। এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকলে আপনি ধীরে ধীরে হয়ে যাবেন একটি খেলার পুতুল। মিডিয়ার মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আপনার মন মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা যেভাবে চাইবে, আপনিও সেভাবেই চিন্তা ভাবনা করবেন। ফলে এই গোষ্ঠীর ক্ষমতা যতোই বাড়তে থাকবে, আপনিও নিজের অজান্তে ততোই পরিণত হবেন তাদের ক্রীড়নকে।

এখন এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যদি নীতি নৈতিকতা থাকে, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা যদি ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রশ্নে সজাগ থাকেন, তাহলে আপনি যা শুনবেন, যা পড়বেন, তা হবে সত্য।

কিন্তু এই গোষ্ঠী যদি হয় নৈতিকভাবে দেউলিয়া, তাদের যদি থাকে শুধুই টাকার নেশা, তাদের উদ্দেশ্য যদি থাকে আপনার সরলতাকে ব্যবহার করে আপনার পকেট থেকে আপনার অজান্তে টাকা বের করে নেয়া, তাহলে আপনি যা জানবেন, যা শুনবেন, যা পড়বেন, তাতে সত্যের সাথে অনেক সময় মিথ্যাও মেশানো থাকবে। আবার অনেক সত্যই গোপন করা হবে। ফলে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না সত্য থেকে মিথ্যাকে

আলাদা করা এবং প্রকৃত সত্যকে জানা। তাই আপনার ভাবনার জগৎ তখন থাকবে ভুল এবং ভ্রান্তিতে ভরা।

একটি দেশ যতোই অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হতে থাকে, মানুষের মনে মিডিয়ার প্রভাবও ততোই বাড়তে থাকে। কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে আসে ব্যস্ততা। ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা দিন দিন কমে যায়। মানুষ হয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক। এই কারণে বাসায় ফিরে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে মিডিয়া। তাই মিডিয়া যা বলে মানুষও তা বিশ্বাস করে।

বাংলাদেশও দিন দিন গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পনির্ভর দ্রুত প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ধারা যতই বাড়তে থাকবে, মানুষ মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ততটাই কমতে থাকবে। বর্তমানে আমরা পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ের আড্ডাতে একটি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত জানতে পারছি। ফলে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে কোন একটি মিডিয়ার পক্ষে আমাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু এই ধারা বেশিদিন থাকবে না। আমরা যতই ব্যস্ত হতে থাকব, পারিবারিক আড্ডা দেয়ারও সময় আমাদের ততটাই কমতে থাকবে। ফলে বাড়তে থাকবে মিডিয়ার উপর আমাদের নির্ভরতা। আর এই নির্ভরতা যতই বাড়তে থাকবে, মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতাও সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে যার অপব্যবহার তারা চাইলেই করতে পারবেন।

বাংলাদেশি মিডিয়ায় রাজনীতি এবং দুর্নীতি

বাংলাদেশি মিডিয়ার সাথে রাজনীতি, ব্যবসা এবং দুর্নীতি কতটুকু জড়িয়ে গেছে তার সদুওর দিতে পারবেন একমাত্র মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাই। তবে একজন সাধারণ পাঠক এবং দর্শক হিসাবে আমার ধারণা বা পারসেপশন হল বাংলাদেশের মিডিয়ার সাথে রাজনীতি, দুর্নীতি এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ এখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। প্রতিটি মিডিয়া হাউসই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বড় বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, না হয় রাজনীতিবিদদের একটি দল। তাই এই সকল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং ক্ষমতাধর সাংবাদিক এবং মিডিয়াকর্মীদের ক্ষুদ্র ক্লাবই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশের মিডিয়া সেক্টর।

এই রাজনীতিবিদদের সাথে আবার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ জড়িত। আমাদের ক্ষমতাধর এলিট গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই কোন না কোন দুর্বলতা আছে। তাই কোন পত্রিকা যদি কোন এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে লিখতে চায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই রাজনীতিবিদও চাইবেন তার প্রতিশোধ নিতে। আর তা যদি তিনি নিতে চান, তাহলে তা হবে খুবই সহজ একটি কাজ। তিনি হয় সরকারের উপরে প্রভাব

খাটিয়ে পত্রিকাটিতে সরকারি বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেবেন, না হয় সেই পত্রিকার মালিক গোষ্ঠীর ব্যবসাতে ঝামেলার সৃষ্টি করবেন। তিনি সেই ব্যবসায়ীকে করফাঁকির মামলায় ফেলে দিবেন।[৩]

এখন প্রশ্ন হল, এই ঝামেলাকে অবজ্ঞা করে সেই সম্পাদক কি সেই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে লিখতে চাইবেন কিনা?

এই ধরণের একটি পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মিডিয়াতে একটি খুব খারাপ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। এটি হল, "ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করো না। কিন্তু তারা যদি ক্ষমতা থেকে নেমে যায়, তাহলে তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়। "

এই অসুস্থ সংস্কৃতি বিকশিত হওয়ার কারণে তত্বাবধায়ক সরকারের আগে বিগত পনের বছরে দুর্নীতি নিয়ে কেউই উচ্চবাচ্য করেননি। ফলে দুর্নীতি বেড়েছে ধীরে ধীরে। এই দুর্নীতি বাড়ার হার সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায় বিগত বিএনপি এবং জামায়াত জোটের শাসনামলে। অথচ তখনো মিডিয়াতে এই ব্যাপারে তেমন একটা আলোচনা কেউ করেননি। কিন্তু জোট শাসনের অবসান হওয়া মাএই সকল পত্রিকাই ঝাপিয়ে পড়েছেন সেই সকল রাজনীতিবিদদের উপর যাদের বিরুদ্ধে অতীতে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে যে বিরাটাকার দুর্নীতি হচ্ছে, তা ছিল একটি অপেন সিক্রেট। সকলেরই মুখে মুখে তা শোনা যেত। কিন্তু আমাদের তথাকথিত ফ্রি মিডিয়া তখন ছিল পুরোপুরি নিরব। তারা যদি এই নিরবতা পালন না করে সময়মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতেন, তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না[৪]।

সাম্প্রতিককালে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তারা যেহেতু এখন আর ক্ষমতাধর নন, তাই আমাদের এক শ্রেণীর পত্রিকা বিগত আমলের উপদেষ্টা এবং ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে। অথচ এই সকল পত্রিকাই বিগত সরকারের আমলে ক্ষমতাধরদের গুণকীর্তনে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিল। তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই বিগত সরকার দুর্নীতি দমনের নামে

[৩] এই ধরণের ভয়ের কারণে অনেক ব্যবসায়ী বিদেশে টাকা পাচার করতে উৎসাহিত হন। একদিকে আয়কর বিভাগের দুর্বলতা, অন্যদিকে ভয় এবং টাকা পাচারের সহজ সুযোগ অবারিত থাকাতে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়তই বিদেশে টাকা পাচার হচ্ছে।

[৪] বাংলাদেশি মিডিয়ার দুর্বলতা এবং এর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আমার একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে। রচনাটির শিরোনাম "অপসাংবাদিকতা এবং আয়নায় নিজের মুখ "। আগ্রহী পাঠকরা এই রচনাটি সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। আমি মনে করি, এই দুর্বলতাগুলিকে মেনে নিয়ে এর সমাধান কি করে হতে পারে, সেই ব্যাপারে সবারই খোলাখুলি আলোচনা করা উচিত।

মূলত রাজনীতিবিদ দমন অভিযান পরিচালনা করেছিল। কিন্তু আজ দিন বদলে যাওয়াতে এক শ্রেণীর মিডিয়ার সম্পাদক রাতারাতি 'নিজেকে বদলে' ফেলেছেন।

তাই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে 'নিজেকে বদলানোর' এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা যদি বন্ধ করা না যায়, তাহলে বাংলাদেশের মিডিয়াতে দুর্নীতির প্রকোপ কোনদিনই কমবে না।

এখন প্রশ্ন হল, যে ফ্রি মিডিয়া সময়মতো মানুষকে তথ্য জানাতে পারে না, এবং ক্ষমতাধরদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে জনমত সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসে না, সেই ফ্রি মিডিয়ার কার্যকারিতা আসলেই কতটুকু?

মিডিয়ার দুর্নীতির মুল উৎস

এম এম মডেল অনুযায়ী মিডিয়া কর্মীদের ক্ষমতা অত্যধিক, এটি আগেই বলা হয়েছে। তাই মিডিয়া কর্মীদের বেতন ভাতা, ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে যদি কোন প্রকার সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে মিডিয়াতে ক্ষমতার অপব্যবহার কমানো যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, মিডিয়া কর্মীদের বেতন ভাতা না হয় বাড়ানো গেল, কিন্তু তাদের জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত হবে ?

এখানে অনেকে বলবেন, মিডিয়া কর্মীরা সমাজের মেধাবী অংশ। তাই তাদের নৈতিকতা অন্যান্যদের চেয়ে শক্তিশালী। অতএব তাদের তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা কাঠামোর কোন প্রয়োজন নেই।

এর উওরে আমি বলব, সমাজে শিক্ষকরা তো সবচেয়ে মেধাবী অংশ। তাদের ক্ষমতাও তো অনেক কম। কিন্তু তারপরও তারা ক্লাশ ফাঁকি দেন কেন ? পদের জন্য রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুলে যান কেন ?

তাই মেধা রয়েছে, অতএব জবাবদিহিতার কোন প্রয়োজন নেই, এই ধরণের কোন প্রকার ধারণায় আমার সমর্থন নেই।

আবার অনেকে বলতে পারেন, মিডিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে পাঠক এবং দর্শকরাই। তাই মিডিয়ার জবাবদিহিতা আপনা আপনিই নিশ্চিত হবে।

এর উত্তরে আমি বলব, মিডিয়ার অধিকাংশ দর্শক এবং পাঠকরাই মিডিয়ার ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারেন না। তারা যা দেখেন, যা পড়েন, তাই পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

কিছু পাঠক এবং কিছু দর্শক আছেন যারা এগুলো বুঝতে পারেন, কিন্তু সমাজ তাদেরকে চেনে না বলে তাদের বক্তব্যের তেমন একটা মুল্য কেউ দেন না।

তাই আমার মতে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেন শুধুমাএ সেই সকল ব্যক্তিরাই যারা এই ক্ষমতার অপব্যবহার ধরতে পারেন এবং একই সাথে যাদের সমাজে একটি অবস্থান রয়েছে। যাদের কথার মুল্য আছে।

কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কখনোই মিডিয়ার দুর্বলতা সম্পর্কে সরব হতে দেখা যায় না, কারণ প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দুর্বলতা রয়েছে[৫]। এটা হতে পারে কোন চারিত্রিক দুর্বলতা, বা হতে পারে কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ।

তাই এই সকল ব্যক্তিরা ভয় পান, তারা যদি মিডিয়ার দুর্বলতা সবার কাছে প্রকাশ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চান, তাহলে মিডিয়াও তার প্রতিশোধ নেবে তাদের দুর্বল দিক প্রকাশ করে। ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিতর্কিত হয়ে যাবেন। তারা সমাজে তাদের সম্মান হারাবেন।

তাই বিতর্কিত হওয়ার ভয়ের কারণেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কখনোই মিডিয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলতে দেখা যায় না।

মিডিয়ার দুর্বলতা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরবতার আরো একটি কারণ রয়েছে।

অনেকের ধারনা মতে আধুনিক বিশ্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, স্টার, এবং সেলেব্রিটি তৈরী করে দর্শক এবং পাঠকরাই। এবং সেই পাঠক এবং দর্শকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর একমাএ মাধ্যম মিডিয়া। এখন এই ধরণের একটি বিশ্বাস প্রবল যে মিডিয়ার সাহায্য ছাড়া কেউ বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্টার কিংবা সেলেব্রিটি হতে পারবেন না। তাই যাদের সাহায্যেই তারা আজকে সমাজে পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের দুর্বলতা নিয়ে তারা কথা বলতে যাবেন কেন ?

[৫] পৃথিবীতে আসলে কোন মানুষকেই ফেরেশতা করে তৈরী করা হয়নি। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা বা অন্ধকার দিক রয়েছে। যাদের মধ্যে আলোর পরিমাণের চেয়ে অন্ধকার বেশি, তারাই সমাজের খারাপ মানুষ। আর যাদের মধ্যে অন্ধকারের পরিমাণের চেয়ে আলোর পরিমাণ অনেক বেশি, তারাই সমাজে আলোকিত মানুষ হিসাবে বিবেচিত।

এই ধরণের বিশ্বাসের কারণেও মিডিয়ার দুর্বলতা নিয়ে কাউকেই প্রকাশ্যে সরব হতে দেখা যায় না। ফলে সঠিক জবাবদিহিতার অভাবে মিডিয়ার ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ফলে একটা সময় আসে যখন মিডিয়া কর্মীরা নিজেদেরকে ঈশ্বরতুল্য ভাবতে শুরু করেন। ভুলটা ধরা পড়ে তখনই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ততদিনে দেশ, জাতি, এবং সমাজকে অনেক মূল্য দিয়ে দিতে হয়।

মিডিয়ার জবাবদিহিতা

মিডিয়ার জবাবদিহিতা সৃষ্টির করার দুটি উপায় রয়েছেঃ

(১) একটি প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার কাঠামো সৃষ্টি করা, অথবা

(২) বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্টার এবং সেলেব্রিটিদের মধ্যে এমন বিশ্বাসের সৃষ্টি করা যে তারা শুধুমাত্র মিডিয়া, দর্শক এবং পাঠকদের সৃষ্টি নন। মিডিয়া, দর্শক এবং পাঠক তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং এদের উপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ বেশি।

এই দুটি উপায়ের মধ্যে আমি দ্বিতীয়টিই বেছে নেব কারণ প্রথমটি ফ্রি মিডিয়ার কনসেপ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং এই ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা কাঠামোর কারণে নতুন দুর্নীতির সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মিডিয়া সংক্রান্ত এই বিশ্বাস কি করে পাল্টানো যায় ?

এই বিশ্বাস পাল্টানো খুবই কঠিন। এটি শুধু যুক্তির ব্যাপার নয়। এখানে ধর্মবিশ্বাসও জড়িত।

তাই এই বিশ্বাস পাল্টানোর জন্য কোন প্রকার জোরজবরদস্তি না করে বরং স্বনামধন্য বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির প্রতি কয়েকটি খোলা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েই একটি চেষ্টা করা যাক[৬]।

প্রথম প্রশ্নটি খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ড. হুমায়ুন আহমেদের কাছে।

আপনার কাছে প্রশ্ন, প্রকাশক কি আপনাকে সৃষ্টি করেছে , নাকি আপনিই প্রকাশক সৃষ্টি করেছেন? নাকি আপনাকে সৃষ্টি করেছে পাঠক ? এখানে কার নিয়ন্ত্রণ বেশি ?

[৬] এই প্রশ্ন করার মানে এই নয় এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্বাস নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে। আমি তাদের নাম উল্লেখ করছি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দেয়ার জন্য।

আমি যদি উল্টোভাবে বলি আপনার লেখনীর কারণেই বাংলাদেশে অগণিত পাঠক এবং প্রকাশকের সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে কি খুব বেশি ভুল বলা হবে?

এবার নাট্যাঙ্গনের সেলেব্রিটি মি. আফজাল হোসেনকে ভিন্ন রকম একটি প্রশ্ন করি।

আপনি যদি বিটিভিতে না এসে শুধু মঞ্চেই নাটক করতেন, তাহলে কার ক্ষতি বেশি হতো ? বিটিভির, নাকি আপনার ? নাকি দর্শকের ? এখানে যার ক্ষতি সবচেয়ে কম, সেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান।

শেষ প্রশ্নটি করি খ্যাতিমান উপস্থাপক মি. হানিফ সংকেতকে।

বর্তমানের অসংখ্য চ্যানেলের যুগে মানুষ যখন বিটিভি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তখন 'ইত্যাদি' শুরু হলে মানুষ আবার বিটিভিতে ফিরে যায় কেন? বিদেশে বসে বিটিভি পাইনা বলে আমাকে ইত্যাদি দেখার জন্য You Tube এর দ্বারস্থ হতে হয় কেন ?

এখানে তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক কম। নিয়ন্ত্রণ তো সব হানিফ সংকেতের হাতে।

অনেকে হয়তো বলবেন, মি. হানিফ সংকেত মিডিয়ারই সৃষ্টি। কারণ তাকে প্রথম বিটিভিতে সুযোগ দিয়েছিলেন মরহুম ফজলে লোহানী তার "যদি কিছু মনে না করেন" অনুষ্ঠানে। তাই তাকে সৃষ্টি করেছেন মরহুম ফজলে লোহানী। তিনি একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু আমি যদি বলি সেই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল মি. হানিফ সংকেতের কমেডি। আমরা ছোটবেলায় তা দেখার জন্যই বসে থাকতাম। তাই মরহুম ফজলে লোহানী তার অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য হানিফ সংকেতের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলেন। ফজলে লোহানী হানিফ সংকেতকে সুযোগ দিয়েছিলেন বটে, তবে তিনি যদি তা না দিতেন তাহলে হানিফ সংকেত হয়তো অন্য কারো সাহায্য পেতেন।

কিন্তু এখানে আবার আটকে যেতে হচ্ছে। ফজলে লোহানী যদি হানিফ সংকেতকে সুযোগ না দিতেন, তাহলে অন্য কেউ কি তাকে এই সুযোগ দিত কিনা?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। আমরা যদি শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, হানিফ সংকেতকে একই রকম অন্য আরেকজন সুযোগ দিতেন, তাহলে হানিফ সংকেতের ক্ষমতা

বেড়ে যাচ্ছে অনেকগুণ। তাই হানিফ সংকেতের স্রষ্টা তিনি নিজেই। তিনি নিজের গুণেই আজকে স্টার হয়েছেন।

আবার যদি শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলি যে ফজলে লোহানী ছাড়া অন্য কেউ হানিফ সংকেতকে সুযোগ দিত না, তাহলে ফজলে লোহানী হয়ে যাচ্ছেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনিই হানিফ সংকেতকে স্টার বানিয়েছেন।

কিন্তু আমরা কি শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে উপরের কোন একটি উওর পাব?

এখানে তো সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

আবার আরো পিছনে ফিরে যদি প্রশ্ন করি, মরহুম ফজলে লোহানীর সাথে যখন প্রথম হানিফ সংকেতের পরিচয় হয়, তার আগেই কি ফজলে লোহানী জানতেন হানিফ সংকেত নামে এক মেধাবী তরুণ আছে যে ভবিষ্যতে স্টার হতে পারবে?

কিংবা হানিফ সংকেত কি আগেভাগেই জানতেন ফজলে লোহানীর দ্বারস্থ হলে তিনি একদিন দেশের সবচেয়ে বড় মিডিয়া স্টার হতে পারবেন?

এই প্রথম দেখাতে কার নিয়ন্ত্রণ ছিল সবচেয়ে বেশি ? হানিফ সংকেতের ? মরহুম ফজলে লোহানীর ? নাকি অন্য কারোর ?

এই তিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ যার সবচেয়ে বেশি সেই হানিফ সংকেতের স্রষ্টা।

পিছন ফিরে দেখা

বর্তমান মিডিয়ার যে ব্যাপক ব্যবহার আমরা দেখছি, তা মূলত বিগত একশ বছরে বিকশিত হয়েছে। তাহলে আমার প্রশ্ন হল, স্টার এবং সেলেব্রিটিরা যদি মিডিয়ার সৃষ্টি হন, তাহলে একশ বছর আগেকার সময়কালে কি কোন স্টার বা সেলেব্রিটি ছিলেন না ?

ছিলেন। যুগে যুগে অনেক স্টার, সেলেব্রিটির জন্ম হয়েছে। তারা খ্যাতিমান হয়েছেন তাদের গুণের মাধ্যমে। তাদের গুণের কারণে তারা অনেকের সহায়তা পেয়েছেন। সেই সহায়তা এবং নিজেদের গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে তারা জগদ্বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। তাদের কাজের সুনাম মানুষের মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছেন শেক্সপিয়ার, আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন, ইবনে সিনা, শেখ সাদী, লিওনার্দো দা

ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো, আব্রাহাম লিংকন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, খলিফা ওমর (রাঃ) প্রমুখ।

অনেকে বলতে পারেন, হ্যা। আগে স্টার ছিল বটে। তবে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। তাছাড়া তখন স্টার হতেও অনেক সময় লাগত। আর যারা স্টার হতে পারেনি, কিন্তু স্টার হওয়ার যোগ্যতা ছিল, তাদের কথা তো আমরা জানি না। বর্তমান যুগে মিডিয়ার মাধ্যমে এটাই সম্ভব হচ্ছে। আমরা বেশি বেশি স্টারের কথা জানতে পারছি।

হ্যা। এটা ঠিক। বর্তমানে স্টার তৈরীর প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার অবদান যদি তুলে ধরতে হয়, তাহলে এই কথাটি স্বীকার করে নিতে হবে। এখন আমরা যে সংখ্যক স্টার পাচ্ছি, সেই সংখ্যক স্টার আগে কখনো ছিল না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা স্টার তো পাচ্ছি অনেক, কিন্তু আরেকজন হুমায়ুন আহমেদ, আফজাল হোসেন কিংবা আরেকজন হানিফ সংকেত আমরা পাব কি ?

আমি বিশ্বাস করি, আমরা পাব না। আমরা যদি আমাদের মিডিয়া, খ্যাতি, দর্শক, পাঠক, স্বীকৃতি এবং সুনাম সম্পর্কিত এই মৌলিক বিশ্বাসে পরিবর্তন না আনি, তাহলে আমরা পাব শুধু নকল স্টার। আসল স্টার আর পাব না। কারণ আসল স্টার, নকল স্টার, উভয় স্টারেরই যিনি স্রষ্টা, তার কাছেই যদি আমরা না চাই, তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে যদি অন্যকে স্বীকৃতি দিতে থাকি, তাহলে তিনি আসল স্টার তৈরী না করে শুধু নকল স্টার তৈরী করবেন। তার প্রতিশোধ তিনি নিবেন এভাবেই।

একটি বড় প্রশ্ন

এই পেপারের শুরুতেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি ব্যাপ্তি নির্ধারণে প্রচলিত যে সকল সূচক রয়েছে তাতে মূলত ঘুষের লেনদেন, জমি দখল, টাকা পাচার, ইত্যাদি সংক্রান্ত দুর্নীতি ধরা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মেধাবী পেশাজীবীদের মধ্যেও যে একটি নিরব অথচ ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজমান, সেই দুর্নীতিগুলো কিন্তু এই সকল সূচকের কোনটিতেই ধরা পড়ে না।

এখন প্রশ্ন হল, দুর্নীতি পরিমাপের জন্য যদি এমন একটি সূচক আবিস্কার করা যায় যাতে অন্যান্য সকল দুর্নীতির সাথে এই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতিও প্রতিফলিত হবে, তাহলে সেই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন হবে ?

বাংলাদেশ কি অতীতের মতো বার বার এই নতুন সূচকে দুর্নীতিতে সবার সেরা হবে?

আর যদি তা না হয়, তাহলে বাংলাদেশের বদলে কোন দেশটি এই পদ দখল করবে?

এই প্রশ্নগুলির কোনটিরই উওর আমার জানা নেই। কারণ আমি দুর্নীতি সংক্রান্ত গবেষণা করলেও দুর্নীতি পরিমাপের কোন প্রকার সূচক তৈরী করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই আমার মনে হয় যাদের এই ধরণের সূচক তৈরী করার অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারাই এই প্রশ্নগুলোর একটি সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন।

২.৩. একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

দুর্নীতি দমন অভিযান বলতে সর্বসাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে যে দুর্নীতিবাজদেরকে ধরে ধরে জেলে পুরে রাখার নামই হল দুর্নীতি দমন অভিযান। খুব সম্ভবত সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ফলে দেশে যখন মূলত রাজনীতিবিদ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের ধরে ধরে জেলে নেয়া হচ্ছিল, তখন সর্বমহলেই এই পদক্ষেপটি একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

কিন্তু এই ধরণের একটি সর্বগ্রাসী দুর্নীতি দমন অভিযানের ফলে সারা দেশেই এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই আতঙ্কের কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে স্থবিরতা নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা তাদের আমদানী কমিয়ে দেন এবং শিল্প কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্তে ধীরে চল নীতি গ্রহণ শুরু করেন। ফলে কমতে থাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ। সেই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধির কারণে দেখা দেয় উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি। এই দুটি চাপের ফলে বাড়তে থাকে সামগ্রিক দারিদ্র্য এবং নেমে যায় জীবন যাএার মান।

এই ধরণের নেতিবাচক প্রভাবের মূল কারণ হল দুর্নীতি বাংলাদেশের একটি অপ্রিয় বাস্ত বতা। অথচ এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেই বিগত আমলে দুর্নীতি দমন অভিযান চালানো হয়েছিল। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিপরীতে আমাদের সমাজে ক্ষমতাধরদের সংখ্যা অনেক কম হলেও এই ক্ষমতাধররাই সমাজ চালাচ্ছেন। তারা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নের্তৃত্ব দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজের এই ক্ষমতাধরদের প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।

এই ক্ষমতাধরদের মধ্যে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। তারা কখনো একা দুর্নীতি করেন না। তাদের দুর্নীতির কারণে লাভবান হয় বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা ব্যবসায়ী যাদের উপরে আবার সমাজ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। তাই একজন ক্ষমতাধরকে যদি দুর্নীতির অভিযোগে ধরা হয়, তাহলে অপর আরেকজন আতঙ্কিত হয়ে যান। মূলত এই কারণেই সাম্প্রতিককালে রাজনীতিবিদদের উপর দুর্নীতি দমন অভিযান চালানো হলেও

ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে দেশে বিনিয়োগ প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিল।

প্রধানত, এই কারণেই সরকার পরবর্তীতে বাধ্য হয় এই ধরণের একটি আগ্রাসী দুর্নীতি দমন অভিযান থামিয়ে দিতে। ফলে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের সময় সর্বশেষ সম্ভাব্য দুর্নীতিবাজদের লিস্টে যাদের নাম ছিল, তাদেরকে সরকার আর গ্রেফতার করেনি।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশের বাস্তবতায় দুর্নীতির সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি প্রদানের আগে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখতে হবে।

১. সরকার এই রকম দুর্নীতির সাথে যুক্ত কয় জন ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দিতে চায়?
২. সরকার যদি শত শত রাজনীতিবিদ, আমলা এবং ব্যবসায়ীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ফেলে এবং জেলদন্ড দিয়ে দেয় তাহলে তাদের উপর যে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের কি হবে? সমাজে তাহলে নের্তৃত্ব কারা দিবে ?
৩. ধরা যাক, সরকার মাত্র দশ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করল দুর্নীতির অভিযোগে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য। তাহলে প্রশ্ন হল এই ধরণের নির্বাচনের ভিত্তি কি হবে?
৪. যদি টাকার লেনদেনের পরিমাণকে দুর্নীতি মাপার একটি মানদন্ড ধরা হয়, তাহলে যে সকল ব্যক্তি টাকা লেনদেন না করেই বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির সাথে যুক্ত আছেন, তাদের কি হবে?
৫. ধরা যাক, সবাই টাকার লেনদেনের পরিমাণকেই দুর্নীতি মাপার মানদন্ড হিসাবে মেনে নিলেন। তাহলে কি পরিমাণ টাকার বেশি টাকা লেনদেন হলে সেই দুর্নীতিবাজকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য ধরা হবে?
৬. যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ১০০ কোটি টাকার উপরের দুর্নীতি যারা করেছেন তাদেরকে ধরা হবে এবং কঠোর শাস্তি দেয়া হবে, তাহলে যারা ৯৯ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে, তারা কি তাহলে ভাল কাজ করেছে?
৭. ধরা যাক, উপরের দশ জনকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য নির্বাচিত করা হল। তাহলে যাদের কঠোর শাস্তি হচ্ছে না, তাদের কি ধরণের শাস্তি হবে?
৮. দ্বিতীয় গ্রুপটির যদি লঘু শাস্তি হয়, তাহলে একই অপরাধে একজনের বেলায় গুরু শাস্তি, আর অপরজনের বেলায় লঘু শাস্তি, এটা আবার কোন ধরণের আইন?

এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর যখন খোঁজা হয়, তখন বিজ্ঞজনরা বলেন দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে হলেও যেন অন্তত গুটিকয়েক ব্যক্তিকে দুর্নীতির কারণে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু আমার কথা হল, বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেনী এবং পেশার ক্ষমতাধরদের মধ্যে ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতি একটি অপ্রিয় বাস্তবতা। তাই এই বাস্তবতাকে স্বীকার না করে

যদি গুটিকয়েক ব্যক্তিকে শাস্তির জন্য নির্বাচন করা হয়, তাহলে যারা এই নির্বাচনটি করবেন, তারা অতি মাত্রায় ঐচ্ছিক ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবেন, যার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী।

তাই আমার অবস্থান হল, আপনি অসামান্য ঐচ্ছিক ক্ষমতার বলে সবাইকে বাদ দিয়ে মাএ গুটিকয়েক মানুষকে 'দুর্নীতিবাজ' বলে গালি দিতে পারেন, তাদেরকে সমাজে হেয় করতে পারেন, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন, তাদেরকে জরিমানা করতে পারেন, কিংবা তাদেরকে নির্বাচন করা থেকে বিরত রাখতে পারেন, কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু আপনার ঐচ্ছিক ক্ষমতার বলে গুটিকয়েক মানুষের উপর সকলের দুর্নীতির অভিযোগ চাপিয়ে তাদের জীবন থেকে বিশটি বছর কেড়ে নিতে পারেন না। এটা মহা অন্যায়।

তাই আমি বিশ্বাস করি, উপরের প্রশ্নগুলির উওর না খুঁজেই যদি কোন প্রকার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো হয়, তাহলে সেই ধরণের অভিযানে শুধুমাত্র বিরোধী ক্ষমতাহীন পক্ষকেই নির্বাচন করা হবে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য। আর যারা পক্ষের লোক, যারা ক্ষমতার কাছাকাছি, তাদেরকে কঠোর শাস্তি থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হবে।

এর প্রমাণ অতীতেও যেমন রয়েছে, তেমনি বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

সাম্প্রতিক অতীতে তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শুধুমাএ ক্ষমতাহীন রাজনীতিবিদ, সাবেক আমলা এবং গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর উপর দুর্নীতি দমন অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল সংস্কারপন্থী রাজনীতিবিদ, বর্তমান আমলা শ্রেণী এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরকে।

একই ধারা বর্তমানেও রয়েছে। এখন উল্টো দুর্নীতি দমনের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা যারা এখন ক্ষমতাহীন এবং বিএনপি সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ যাদের সংসদে আসন মাত্র ২৮টি। অথচ বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গকে। একইসাথে বাদ যাচ্ছেন ক্ষমতাধর আমলা শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সমাজ।

সবসময় ক্ষমতাহীন পক্ষকে টার্গেট করার এই ধারা চলতে থাকলে যারা দুর্নীতি দমনের সাথে জড়িত থাকবেন, তারা অসামান্য ঐচ্ছিক ক্ষমতা ভোগ করবেন যার অপব্যবহার তারা চাইলেই করতে পারবেন। ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন এই ধারার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান বিতর্কিত হয়ে পড়বে। ফলে সেই অভিযান আর চালানো সম্ভব হবে না। ফলে দেশ থেকেও কোনদিন দুর্নীতি দুর হবে না।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান বলতে তাহলে আমরা কি বুঝি?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমাদের সবার আগে ঠিক করতে হবে আমরা দীর্ঘমেয়াদে কি রকম বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই?

আমাদের দীর্ঘমেয়াদের লক্ষ্য

আমাদের দীর্ঘমেয়াদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে কোন দুর্নীতি থাকবে না, থাকবে না কোন দারিদ্র্য, রাজনীতি হবে গণতান্ত্রিক এবং স্থিতিশীল, এবং সমাজ হবে অগ্রসরমান এবং আধুনিক। আমরা অন্তত বিশ বছর পর এমন একটি প্রজন্ম চাই যারা কোন দুর্নীতি করবে না। আমরা সেই সময়ে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই যেখানে দুর্নীতি করার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

তাই দুর্নীতি দমনের যে কোন কৌশল ঠিক করতে গিয়ে আমাদেরকে সব সময় এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে। এর অর্থ হল দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে আমরা যদি আমাদের দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলি, অর্থনীতির সচল চাকা যদি অচল করে দেই, রাজনীতিকে যদি নের্তৃত্বশূন্য করে দেই, তাহলে আমরা আমাদের সেই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে কখনোই পৌঁছাতে পারব না।

তাই এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে দুর্নীতি দমনের কৌশল বিবেচনা করতে হবে। এর সাথে সচল রাখতে হবে অর্থনীতি। দারিদ্র্য বিমোচনও চলবে একই গতিতে।

এখানে বলা দরকার, দুর্নীতি দমন অভিযানে নানা ধরণের উপকরণ রয়েছে।

দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা যেমন দুর্নীতি দমন অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, তেমনি সরকারি বিভাগগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতি দমনের প্রতিষ্ঠান তৈরী, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি এবং প্রভাবমুক্ত মিডিয়ার উন্নয়ন ইত্যাদিও দুর্নীতি দমন অভিযানের অনুষঙ্গ। তবে দুর্নীতি দমনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল নৈতিকতার উন্নয়ন।

দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের প্রতিটি উপকরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া এই পেপারের উদ্দেশ্য নয়। পাঠকরা যদি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে ট্রান্সপারেন্সি

ইন্ট্যারন্যাশনালের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। এর ঠিকানা www.transparency.org।

তবে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইএফডির একটি ভিন্ন অবস্থান রয়েছে, শুধু সেই বিষয়গুলিই এখানে আলোচনা করা হল।

কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান

আমাদের দেশে দুর্নীতি সর্বগ্রাসী। এমন কোন সেক্টর পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতির প্রকোপ নেই। এটি যেমন সরকারি খাতগুলির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সত্য বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রেও।

একটি শক্তিশালী জবাবদিহিতা কাঠামো না থাকাতে এবং ক্ষমতার সাথে বেতন ভাতার ব্যাপক বৈষম্য থাকাতে আমাদের সরকারি বিভিন্ন বিভাগ গুলিতে যেমন দুর্নীতির প্রকোপ অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় অনেক বেশি, তেমনি বেসরকারি খাতেও রয়েছে ভেজাল, কর ফাঁকি[৭], ইত্যাদির মতো নানা অনিয়ম।

তাই এমন একটি দেশে দুর্নীতি দমন করতে হলে প্রথমেই এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে মানুষ সৎ থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করবে। তাই সমাজে সৎ থাকার সুযোগ সৃষ্টি না করে যদি সবাইকে দুর্নীতির অভিযোগে ধরে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাতে সমাজের স্থিতিশীলতাই নষ্ট হবে।

এই ধরণের একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অর্থ এবং সময়। তাই সময় যত যাবে, ততই এই কার্যক্রম ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। ফলে মানুষকে সৎ হওয়ার উপায় বাতলে দেয়ার পাশাপাশি মানুষকে এই ধারণাও দিতে হবে যে এখন সৎ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এই ধরণের একটি ধীর গতির কিন্তু ক্রমবর্ধণশীল দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনা করলেই আমাদের সমাজ থেকে ধীরে ধীরে দুর্নীতি বিতাড়িত হবে।

[৭] বাংলাদেশের আইনে কর ফাঁকি এবং সম্পদের তথ্য সরকারের কাছে গোপন করা আইনত দন্ডনীয়। বর্তমান প্রচলিত আইনে এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদেরকে এই অপরাধে সর্ব্বোচ্চ ১৩ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

দুর্নীতি ধরার কৌশল

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমনের অনেক সনাতন ধারণা খুব একটা কার্যকরী নয়। এর কারণ প্রথমত, বাংলাদেশে জনসংখ্যা অত্যধিক, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে দুর্নীতি এখন সর্বব্যাপী।

তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি ধরার উপায় মাএ দুটিঃ

১. কাউকে দুর্নীতি করার সময়ই হাতে নাতে ধরা, এবং

২. মানুষের আয়, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের মাঝে যদি কোন বৈষম্য থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যায়, এই বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ দুর্নীতির কারণে। তাই এই বৈষম্য যাদের রয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধরে নিতে হবে তারা বিভিন্ন উপায়ে দুর্নীতি করছে।

আমাদের দুর্নীতি দমনে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য কি, তার উপরে নির্ভর করবে আমরা কোন কৌশলটি দুর্নীতি দমনের কৌশল হিসাবে নির্বাচন করব। আমরা যদি সমাজে দুর্নীতির সম্পর্কে একটি সাধারণ ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাই, আমরা যদি ঠিক করি সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মুলের প্রয়োজন নেই বরং একটি মাঝারি মানের দুর্নীতির সাথেই আমাদেরকে সহাবস্থান করতে হবে, তাহলে শুধু প্রথম কৌশলটি দিয়েই সেই রকম একটি পরিবেশ আনা সম্ভব।

তবে প্রথম কৌশলটি চটকদার হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় এর মাধ্যমে সফলতা পাওয়া সহজ নয়। কারণ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অনেক বেশি হওয়াতে দুর্নীতিবাজদেরকে হাতে নাতে ধরার জন্য সরকারের প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হবে। সেই সাথে লাগবে উন্নত মনিটরিং ডিভাইস যেমনঃ সিসি টিভি, গোপন ক্যামেরা ইত্যাদি।

তবে প্রচুর লোকবলকে যদি দুর্নীতি হাতে নাতে ধরার কাজে নিয়োজিত করা হয়, তাহলে দুর্নীতি না কমে বরং আরো বেড়ে যেতে পারে। কারণ এই বিশাল সংখ্যক সরকারি অফিসারদেরকে কড়া জবাবদিহিতার মধ্যে না রাখলে তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন। ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

তাই আমরা যদি ঠিক করি আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাই, তাহলে প্রথম কৌশলটির সাথে সাথে দ্বিতীয় কৌশলটিরও প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় কৌশলটির বাস্তবায়নও অনেক কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। সরকার যদি এখন হঠাৎ করে মানুষের আয়, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের বৈষম্য তালাশ করা শুরু করে, তাহলে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। কারণ আয়, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভারসাম্য আছে কিনা, তা সরকার পরীক্ষা করতে পারে একমাএ ট্যাক্স রিটার্নের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে সৎ করদাতার সংখ্যা যেমন নেহাত কম, তেমনি করযোগ্য আয় আছে, কিন্তু টিন (Taxpayer's Identification Number or TIN) নেই এবং কোন প্রকার রিটার্ন কোনদিন দাখিল করেননি, এমন ব্যক্তির সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। তাই হঠাৎ করে যদি আয়, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের বৈষম্য দেখে দেখে যদি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো হয়, তাহলে সমাজে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হবে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের সময়।

তাই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরুর সাথে সাথে নাগরিকদেরকে একটি Exit Route বা বহির্গমন পথ না দিলে এই ধরণের দুর্নীতি দমন অভিযান দীর্ঘমেয়াদে তার কার্যকারিতা হারাবে।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেয়া কিংবা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া এমনই একটি Exit Route। আমার প্রস্তাব হল, দুর্নীতি দমন অভিযান চালু করার পাশাপাশি যদি কালো টাকা সাদা করার সুযোগ খুলে দেয়া হয়, তাহলে মানুষের মনে কালো টাকা নিয়ে এক প্রকার ভীতি জন্মাবে। ফলে যাদের কালো টাকা আছে তারা যেমন তাদের অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করতে উৎসাহিত বোধ করবেন, তেমনি যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এখনো কর দেয়ার জন্য নিবন্ধিত হননি, তারাও কর দিতে তাগিদ বোধ করবেন।

এই ধরণের একটি দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের ব্যাপ্তি, গতি এবং আওতা যতই বাড়তে থাকবে, সরকারেরও উচিত হবে সেইসাথে কালো টাকা সাদা করার করহার ধীরে ধীরে বাড়ানো। ফলে মানুষ তাদের অপ্রদর্শিত আয় তাড়াতাড়ি বৈধ করার প্রতি উৎসাহ বোধ করবে। সেই সাথে যে সকল সম্পদ এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে প্রদর্শিত করা হয়নি, সেই সম্পদগুলিকে একটি নির্দিষ্ট জরিমানার মাধ্যমে বৈধ করার সুযোগ সরকারকে দিতে হবে। এই জরিমানার পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ানো যেতে পারে।

মানুষ যাতে তাদের অপ্রদর্শিত আয় এবং সম্পদ বৈধ করতে চাপ অনুভব করে, সেজন্য ট্রুথ কমিশনের মতো একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে যেখানে কালো টাকার

মালিকদেরকে প্রয়োজনে হাজির করে উচ্চহারে জরিমানা করা হবে[৮]। ফলে এই কমিশনের হাতে পড়ে যাওয়ার ভয় থেকে মানুষ তাদের অপ্রদর্শিত আয় দ্রুত বৈধ করবে।

এই ধরণের একটি যুগপৎ দুর্নীতি দমন অভিযান এবং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের হাতে কোন কালো টাকা থাকবে না, কোন অপ্রদর্শিত সম্পদও থাকবে না। ফলে সরকারের তখন উচিত হবে কালো টাকা সাদা করার এই সুযোগটি চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা।

এরপর থেকে সরকার নাগরিকদের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য আছে কিনা তা নিয়মিত মনিটর করবে। ফলে কারো পক্ষে যেমন দুর্নীতি করার সুযোগ থাকবে না, তেমনি দুর্নীতি করেও কেউ সহজে রেহাই পাবে না।

বিগত বছরগুলিতে এবং সাম্প্রতিককালে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে অনেক হই চই হয়েছে। বিগত বাজেটে বর্তমান সরকার অনেকগুলি খাতে এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে এক বছরের জন্য ১০% করের বিনিময়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু অনেকেই শুনে আশ্চর্য হবেন যে একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া এই সুযোগটি দেয়ার আসলে কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। তাই একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের দাবী না তুলে এই সুযোগটির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকার আলোচনারও কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। এই ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত জানার জন্য বিস্তারিত আলোচনা পড়ুন সংযুক্তি ১ এ।

প্রশাসনে সংস্কার

তবে শুধু দুর্নীতি দমন অভিযান করে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ খোলা রাখলেই দেশ থেকে দুর্নীতি কমবে না। আমাদের সরকারি বিভাগগুলিতে যতদিন ক্ষমতা, বেতন-ভাতা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকবে, দুর্নীতি তৈরী হওয়ার ক্ষেএও ততদিন থাকবে। ফলে কালো টাকার মুল উৎস কখনোই বন্ধ হবে না[৯]।

তাই এম এম মডেলের মুল ধারণা অনুযায়ী আমাদেরকে প্রশাসনে সংস্কার কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতা,

[৮] স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের দুর্নীতি স্বীকার করার কোন প্রকার আইন কিংবা প্রস্তাবের প্রতি আমার সমর্থন নেই। আমার মতে, ট্রুথ কমিশন হওয়া উচিত সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা সুযোগ পেয়েও কালো টাকা সাদা করছেন না। এই ধরণের ব্যক্তিদেরকে ট্রুথ কমিশনে এনে তাদের দুর্নীতি স্বীকারে বাধ্য করে সমাজে হেয় করা হবে এবং অতি উচ্চ হারে জরিমানা করা হবে। এই ধারা না থাকলে ট্রুথ কমিশন সম্পর্কে মানুষের ভীতি জন্মাবে না।

[৯] এখানে বলা দরকার, অবৈধ আয়ের সুযোগের পাশাপাশি আয়কর আইনের দুর্বলতা, আয়কর প্রদানের জটিলতা, টাকা সহজে বাইরে পাচার করে দেয়ার অবাধ সুযোগ এবং বিদেশে গোপনে অবৈধ টাকা রাখার প্রণোদনাও কালো টাকা তৈরীতে মানুষকে উৎসাহিত করে।

জবাবদিহিতা এবং বেতন ভাতার মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি চাকুরি করে দুর্নীতি করার প্রয়োজন অনেক কমে আসবে এবং সেই সাথে ব্যক্তিখাতের সাথে পাল্লা দিয়ে সরকারি চাকুরিও অনেক আকর্ষণীয় হবে। ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সরকারি চাকুরি নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হবে যার প্রভাবে আমরা আরো অধিকতর দক্ষ এবং মেধাবী সরকারি অফিসার পাব।

বর্তমানে যারা সরকারি চাকুরিতে ঢুকছেন তাদের অনেকেরই প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য থাকে দুর্নীতি করা। কিন্তু উপরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখলে এই ধরণের নৈতিকভাবে দুর্বল সরকারি অফিসারের সংখ্যা দিন দিন কমে আসবে।

এম এম মডেল অনুযায়ী সরকারি বিভাগগুলিতে দুর্নীতি কমাতে হলে প্রতিটি বিভাগকে প্রথমেই ক্ষমতার ক্রমানুযায়ী একে একে সাজাতে হবে।

এরপর সবার সাথে আলোচনা করে ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে আলাদা আলাদাভাবে বেতন ভাতা এবং জবাবদিহিতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেহেতু বহি: জবাবদিহিতার প্রভাব সকল বিভাগে সমান, সেহেতু মোট জবাবদিহিতা বাড়ানো যাবে অন্ত: জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে কঠোর করে।

এম এম মডেলের ক্ষমতার মাপক অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি বিভাগগুলিকে কিভাবে ক্রমানুযায়ী সাজানো যেতে পারে, তার একটি নমুনা অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলঃ

ক্ষমতার পরিমাণ	**বিভাগের নাম**
অতি উচ্চ ক্ষমতা	প্রশাসন বিচার বিভাগ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ অন্যান্য
উচ্চ ক্ষমতা	স্বাস্থ্য বিভাগ কাস্টমস এবং আয়কর বিভাগ পররাষ্ট্র বিভাগ অন্যান্য
মধ্যম ক্ষমতা	সমুদ্র বন্দর সমূহ কৃষি বিভাগ অন্যান্য
নিম্ন ক্ষমতা	পরিসংখ্যান বিভাগ ডাক বিভাগ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল বিভাগ অন্যান্য

তাই এভাবে ক্ষমতার ক্রমানুযায়ী বিভাগগুলিকে আলাদা করে প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা বেতন কাঠামো এবং জবাবদিহিতার কাঠামো ঠিক করতে হবে। তবে এই ক্ষমতার মাপক অনুযায়ী শিক্ষকদের ক্ষমতা কম হলেও তাদের বেতন ভাতা এই সংস্কার কর্মসূচির আওতার বাইরে গিয়ে ঠিক করতে হবে। কারণ শিক্ষকদের যদি ক্ষমতা অনুযায়ী বেতন কম দেয়া হয়, তাহলে মেধাবীরা আর শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হবে না। ফলে শিক্ষার মানও নেমে যাবে যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের উন্নয়নের গতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

তবে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে সরকারের আয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন কোন বিভাগে এভাবে বেতন বাড়ানোর পদক্ষেপ বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে।

এই সমস্যা কাটানোর জন্য সেবার মূল্য ধার্য করা যেতে পারে এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। এটি সম্ভব হলে সরকারি অফিসারদের আয় যেমন বাড়বে তেমনি তারা সেবাদানে আরো আগ্রহী হবেন।

সবচেয়ে বড় কথা হল আয় বৃদ্ধি করার জন্য তারা নতুন নতুন সেবা চালু করবেন। ফলে এর সুফল পাবে সাধারণ জনগণ।

আইডিয়াটি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগামের টিউশন ফি'র একটি অংশ শিক্ষকরাও পাচ্ছেন। ফলে তারা যেমন ক্লাস নিতে আগ্রহী হচ্ছেন তেমনি স্টুডেন্টরাও পাচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষা।

কিছুদিন আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও আয়করের একটি অংশ আয়কর আদায়কারী অফিসারদের মধ্যে বন্টন করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

তবে এতে খেয়াল রাখতে হবে নতুন নতুন সেবা চালু করতে গিয়ে তা যেন ব্যক্তিখাতকে বিপদের মধ্যে ঠেলে না দেয়। তাই কোন সেবা চালু করা যাবে এবং এর মূল্য কত হবে, তা ঠিক করার জন্য একটি সরকারি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

তবে আমাদের মতো দেশগুলিতে দুর্নীতি কমাতে হলে আগে বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাই ক্ষমতার কালো বারটিকে যদি আগেই নামিয়ে আনা

যায়, তাহলে বেতন ভাতা এবং জবাববিদিহিতাকে সমন্বয় করতে খুব বেশি ব্যয় করতে হবে না।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা কমানোর কার্যক্রম অনেকদিন ধরেই চলছে। আয়কর বিভাগে আয়কর প্রদান যেমন সহজ করা হয়েছে তেমনি এর নিয়মকানুনও শিথিল করা হয়েছে। সেইসাথে সরকার বিভিন্ন বিভাগে সংস্কারের লক্ষ্যে রেগুলেটরী রিফর্ম কমিশন গঠন করেছে। আশা করা যায় এই কমিটি বিভিন্ন বিভাগের নিয়মকানুন পর্যালোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য সংস্কারের প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করবে।

তবে কোন কোন বিভাগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কমানোর এই পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমন পুলিশ এবং র‍্যাবের ক্ষমতা যদি কমিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই সকল বিভাগের ক্ষেত্রে বর্তমান ক্ষমতার সাথে বেতন কাঠামো এবং জবাবদিহিতার সমন্বয় সাধনের বিকল্প কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন হল, প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য তো প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এই টাকা তাহলে কোথা থেকে আসবে?

আমার মতে, এই টাকা আমাদেরকে যোগাড় করতে হবে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকেই। যেমন দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে শুরু করা যায় তাহলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। ফলে এই অতিরিক্ত রাজস্বের উপর নির্ভর করে সরকার ভবিষ্যতে ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিতে পারবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কার্যক্রম ইতিমধ্যেই একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই সরকারের উচিত এই প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করা।

প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যক্রমের প্রভাব

এম এম মডেল অনুযায়ী প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যক্রমের প্রভাব হবে সুদুরপ্রসারী। এই রকম সম্ভাব্য কয়েকটি প্রভাব নীচে দেয়া হলঃ

১. প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে সরকারি বিভাগগুলিতে দুর্নীতি কমে আসবে।

২. সার্ভিস চার্জের কারণে সরকারি অফিসাররা দ্রুত কাজ করায় আগ্রহী হবেন। ফলে কমে আসবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং লালফিতার দৌরাত্ম।

৩. সরকারি অফিসাররা নিজেরা মিলেই নতুন নতুন সেবা চালু করবেন। ফলে সরকারি বিভাগগুলির সেবার মান অনেক বেড়ে যাবে। সেই সাথে মানুষও পাবে নিত্যনতুন সেবা।

৪. ক্ষমতার ক্রমানুযায়ী বেতন ভাতার সামঞ্জস্য বিধান করার ফলে অধিকতর ক্ষমতাধর বিভাগে অধিক মেধাবী অফিসারদের সমাবেশ ঘটবে। ফলে উন্নত হবে সামগ্রিক সেবার মান। যেমন বর্তমানে সবচেয়ে মেধাবীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু পরিবর্তিত কাঠামোতে সর্ব্বোচ্চ মেধাবীরা পুলিশ এবং র‍্যাব বিভাগে যোগ দিতে অধিকতর উৎসাহী হবে। ফলে এই নতুন ধারা সৃষ্টি হলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেমন উন্নয়ন হবে তেমনি অপরাধী দমনেও সফলতা আসবে। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান যুগে নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিস্কারের কারণে অপরাধের ধরণ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তাই এই সকল অপরাধ দমন করার জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা বিভাগে প্রয়োজন অধিকতর মেধাবী অফিসার।

৫. সরকারি চাকুরি আরো অনেক আকর্ষণীয় হবে। ফলে নতুন প্রজন্ম সরকারি চাকুরিতে যোগ দিতে আরো বেশি উৎসাহিত হবে।

৬. মেধার সন্নিবেশ হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতির সঞ্চার হবে যার প্রভাব পড়বে সামগ্রিক জীবনে।

৭. সরকারি অফিসারদের দ্রুত কাজ করার জন্য উন্নয়নের গতি অনেক বেড়ে যাবে। আগে যে প্রকল্প পাশ হতে মাসের পর মাস চলে যেত সিদ্ধান্তহীনতায়, সেই সকল প্রকল্পে সময় লাগবে অনেক কম।

নৈতিকতার উন্নয়ন

সমাজের সকলের মধ্যে নৈতিকার উন্নয়ন কি করে ঘটানো যায়, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হতে পারে। এর জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে বিদেশী কনসালটেন্ট, গ্রহণ করা যেতে পারে হাজার কোটি টাকার নতুন নতুন প্রকল্প।

তবে আমার মতে, আমরা যদি সকলের মাঝে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বাড়াতে পারি, তাহলেই অতি দ্রুত সমাজের সকলের মধ্যে নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব।

বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই সততার জয়গান গায়, অসততা এবং অপরাধ প্রবণতাকে তিরস্কার করে। তাই ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়ানো গেলে মানুষ নিজেই নিজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এর জন্য বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে না।

আমরা যদি সকলের মাঝে এই বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দিতে পারি যে এক আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের সকল কর্মকান্ডের উপর চোখ রাখছেন, এবং মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে তার কাছে ফিরে গিয়ে সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে মানুষের মনে প্রতিটি কাজের বেলায় আল্লাহভীতি কাজ করবে। এবং এই আল্লাহভীতির কারণেই মানুষ সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দুরে থাকবে।

সমাজে নৈতিকতা উন্নয়নের বিষয়ে যখনই কোন আলোচনা করা হয়, তখনই ধর্মের গুরুত্বের কথা হালকাভাবে উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু কখনোই এই বিষয়টির উপর জোর দেয়া হয় না। এর কারণ আমরা সবাই মিলে ধর্মকে একটি সংবেদনশীল বিষয় বানিয়ে ফেলেছি এবং দেশের নীতি ধর্মের পক্ষে থাকবে নাকি বিপক্ষে থাকবে, সেই ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্যে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি।

নৈতিকতা বৃদ্ধির আলোচনা অনুষ্ঠানে যদি ধর্মের গুরুত্বের কথা বিষদভাবে আলোচিত না হয়, তাহলে ধর্মকে এড়িয়ে নৈতিকতা বৃদ্ধির এই আলোচনা বাস্তবে কতটুকু ফলপ্রসু হবে, সেই ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, সততার কথা যদি বলা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে, মানুষ কেন সৎ থাকবে ? তার সৎ থাকার প্রয়োজন কি ?

এর উত্তর কিন্তু ধর্মগ্রন্থতেই রয়েছে। এর উত্তর হল মানুষের সৎ থাকার প্রয়োজন রয়েছে কারণ সৎ থাকলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে মৃত্যুর পর বেহেশত পাওয়া যাবে যা হবে চূড়ান্ত সফলতা। তাই এই উত্তর যদি জোর গলায় বলা না হয়, তাহলে নৈতিকতা বৃদ্ধির যে কোন পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পাশ্চাত্যের জনগোষ্ঠীর সাধারণ নৈতিকতা জ্ঞান আমাদের চেয়ে বেশি। আশা করি, সকলেই এই বিষয়ে একমত হবেন। কিন্তু এই বাস্তবতার কারণ কি, তা আমরা কখনোই কিন্তু খুঁজে দেখিনি। আমরা সবসময় ভুলে যাই পাশ্চাত্যে পবিত্র বাইবেল সর্ব্বোচ্চ পঠিত একটি গ্রন্থ। যে কোন খৃষ্টানকে পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে কোন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তার একটি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কয়জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা আমাদের ধর্মগ্রন্থতে কি আছে তা বিষদভাবে জানেন ?

আমার নিজের কথাই এখানে তুলে ধরি। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পবিএ কোরআনে কি আছে তা মূলত জানতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে। এর আগে আমি আরবি কোরআনে আসলেই কি আছে, তার কিছুই জানতাম না। এর কারণ আমাকে কখনোই এই পবিএ ধর্মগ্রন্থটি বুঝতে দেয়া হয়নি। এই ব্যাপারে সরকার থেকেও যেমন বলা হয়নি, তেমনি পরিবার থেকেও বলা হয়নি।

এই বাস্তবতা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যও যেমন প্রযোজ্য, তেমনি যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমাদের দেশে কয়জন হিন্দু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলি পুরোপুরি পড়েছেন এবং বোঝার চেষ্টা করেছেন ?

আমার মনে হয়, এই সংখ্যাটি খুব বেশি নয়।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা যদি ড. ইমরানের উদাহরণের দিকে আবারো তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, তার কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আসলে তেমন কোন পন্থা নেই। তিনি একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হওয়াতে তার বিষয়ে অন্যদের জ্ঞানের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি ভাবছেন, তার এই ভুল আর কেউ দেখেনি।

কিন্তু এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। ধর্ম মানুষকে এই শিক্ষাটিই দেয় যে আল্লাহ আমাদের সবকিছুর উপর লক্ষ্য রাখছেন। তার কাছ থেকে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাই মৃত্যুর পর এই দুর্নীতির জন্য ড. ইমরানকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তখন দোষী সাব্যস্ত হলে তার যে শাস্তি হবে তা কোনভাবেই তিনি থামাতে পারবেন না।

এই বিশ্বাস শুধুমাএ সমাজের মেধাবী অংশের জন্যই প্রযোজ্য নয়। বরং সমাজের প্রতিটি মানুষের মনেই এই বিশ্বাসের মাধ্যমে জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

যেমন, একজন রিক্সাওয়ালা যদি ঢাকায় নতুন আসা এক অন্ধ যাত্রীর কাছ থেকে ভুলিয়ে দশ টাকার বদলে বিশ টাকা ভাড়া আদায় করে নেন, তাহলে এই রিক্সাওয়ালার জবাবদিহিতা কে নিশ্চিত করবে?

অন্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এর জন্য পুলিশকে ডাকবেন না। তাই এখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে রিক্সাওয়ালাকেই। তার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যে তিনি যদি কোন নিরীহ যাত্রীকে ঠকান, তাহলে আখিরাতে আল্লাহপাক তার বিচার করবেন, তাহলে এই রিক্সাওয়ালা নিজ থেকেই কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন।

আবার কোন এক দোকানদার যদি ভোক্তার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জেনেশুনে একটি খারাপ পণ্য বিক্রি করেন, তাহলে ভোক্তা এর জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করবে ? সে কি এর জন্য আদালতে যাবে? সে যদি বুঝতেই না পারে যে সে ঠকেছে, তাহলে এই দোকানদারের অন্যায় আচরণ কমানোর উপায় কি?

কিন্তু এই দোকানদারের মনে যদি আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে তিনি যেমন ভোক্তাকে ঠকানো থেকে নিজেই বিরত থাকবেন, তেমনি কোনপ্রকার মজুদদারী, ভেজাল মেশানো ইত্যাদি অপরাধ থেকেও নিজ থেকেই দুরে থাকবেন। এর জন্য কোন প্রকার বহিঃজবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

এম এম মডেল অনুযায়ী মানুষের মনে যদি নৈতিকতাবোধ কিংবা আল্লাহভীতি জাগানো যায়, তাহলে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তার মন থেকে লোভ বিতাড়নের জন্য তাকে প্রচুর বেতন দেয়ারও কোন দরকার নেই। তাই এই ধরণের একটি সমাজ ব্যবস্থায় দুনীতি দমনের মোট খরচ হবে অনেক কম। এই বেঁচে যাওয়া টাকা তখন সরকার ব্যবহার করতে পারবে নানা উন্নয়নমুলক কাজে।

প্রচলিত আধুনিক ধারণা মতে সমাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সংসদ, আদালত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, দুনীতি দমন কমিশন, মিডিয়া, ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে সবসময় সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এর কারণ মানুষের মনে ষড়রিপু রয়েছে। মানুষ যেমন অর্থবিওকে ভালবাসে, তেমনি তার মনে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, অহংকার ইত্যাদি দুর্বলতাও রয়েছে।

তাই আমরা দেখতে পাব সমাজে যেমন অনেক বিষয় রয়েছে যা এই প্রতিষ্ঠানগুলির আওতার বাইরে, তেমনি আইনের দুর্বলতার কারণেও অনেক অন্যায় সংঘটিত হতে পারে, যা এই প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও ধরা সম্ভব হবে না। অনুন্নত বিশ্বে দুনীতিগুলো হয় মুলত এই সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আইনকে সরাসরি অবজ্ঞা করতে গিয়ে। তাই অনুন্নত বিশ্বের দুনীতি ধরা পড়ে বিভিন্ন সুচকে।

আর উন্নত দেশগুলিতে দুনীতি হয় এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতার বাইরে গিয়ে, কিংবা আইনের দুর্বলতাকে পুঁজি করে। এই কারণে এই সকল দুনীতি কোন সুচকেই ধরা পড়ে না। তাই দুনীতি মাপার সুচকের সবচেয়ে নীচে সবসময় বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশগুলির নামই শুধু দেখা যায়। উন্নত কোন দেশের নাম কখনোই উঠে না।

তাই দুর্নীতি মাপার একটি সঠিক সূচক তৈরী করে আমরা যদি এখন বছর বছর দুর্নীতি মাপতে থাকি, এবং ধীরে ধীরে এই সূচক থেকে উন্নত, অনুন্নত সকল দেশকেই দুর করতে চাই, তাহলে ধর্মের পক্ষে কথা বলা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ খোলা নেই।

শেষ কথা

অনেকেই হয়তো জানেন না, প্রতিটি সমস্যার অন্য পিঠেই রয়েছে সম্ভাবনার একটি বিপরীত চিত্র। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি সমস্যা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এটি এখন প্রমাণিত সত্য যে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীই একদিন সম্পদে পরিণত হবে।

একই কথা বন্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বন্যাকে বাংলাদেশে সবসময় একটি সমস্যা হিসাবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই প্রতি পাঁচ বছরে বাংলাদেশে যদি একটি বড় বন্যা না হয়, তাহলে এই ছোট্ট দেশের জমির উর্বরতা কমে খাদ্যাভাব দেখা দেবে।

ইদানিং জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জন্য একটি হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বের তাপমাত্রা যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের একটি বিশাল অংশ নাকি পানির নীচে তলিয়ে যাবে। ফলে সঙ্কটের মুখে পড়বে এক বিরাট জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী কোথায় যাবে, কি করবে, তার কোন উত্তর নেই।

কিন্তু আমরা খেয়াল করলে দেখব, একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। তাদের বর্তমান জনসংখ্যাকে টিকিয়ে রেখে উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য আগামীতে তাদেরকে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে জনসংখ্যা আমদানী করতে হবে।

তাই আমরা যদি নিজেদেরকে একটি শিক্ষিত, মেধাবী, বিনয়ী, নৈতিকতায় উন্নত এবং সর্বোপরী একটি আধুনিক এবং সভ্য জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে এই উন্নত দেশগুলি ইমিগ্রেশনের বেলায় নিশ্চয় আমাদেরকে প্রাধান্য দেবে। ফলে বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সুসংহত হবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা।

একইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে আজ একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ভোক্তা অতিরিক্ত মূল্য দিলেও এর থেকে লাভবান হতে পারে কৃষক সমাজ। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের আয় বাড়ানোর বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া হলে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ত্বরান্বিত হবে।

দুর্নীতিকেও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তা আপনারাই ভেবে বের করুন। শুধু ভাবুন দেশে সবস্তরে দুর্নীতি থাকার কারণে আমাদের কি কি লাভ হয়েছে।

তবে তার মানে এই নয়, আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, দুর্নীতি, দ্রব্যমুল্যসহ অন্যান্য সকল সমস্যাকে স্বাগত জানাবো। আমাদের দায়িত্ব শুধু আমাদের মতো করে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করে যাওয়া। সমাধান কোন পথে আসবে তার সবটুকু নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আমাদের হাতে নেই।

ইমেইলঃ ideasfd@gmail.com
ওয়েবঃ www.ideasfd.org

কালো টাকা – সাদা টাকা এবং কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান

কালো টাকা–সাদা টাকা কি?

কালো টাকা বা অপ্রদর্শিত আয় হল সেই টাকা যার ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন হিসাব নেই। আপনি যদি ১০০ টাকা আয় করেন, কিন্তু আয়কর দিতে গিয়ে কর ফাঁকি দেয়ার জন্য বলেন আপনি আসলে আয় করেছেন ৬০ টাকা, তাহলে সেই বাকি ৪০ টাকা কালো টাকা হিসাবে বিবেচিত হবে।

এই ধরণের কালো টাকা প্রতিনিয়ত অর্থনীতিতে তৈরী হচ্ছে। সরকারি অফিসার এবং রাজনীতিবিদরা যেমন দুর্নীতি করে আয় করছেন যার আবার কোন কর দেয়া হচ্ছে না, তেমনি ব্যবসায়ীরাও কর ফাঁকি দিচ্ছেন, আন্ডার ইনভয়েস করে পণ্য আমদানী করে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে আছেন যারা মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাস কিংবা হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আয় করছেন যার কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের মূল অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ এই কালো অর্থনীতি কারণ আমাদের দেশে ট্যাক্স দেয়ার তেমন কোন সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। যারা বিভিন্নভাবে টাকা আয় করে লুকিয়ে ফেলছেন তারা হয় সেই টাকা দিয়ে গাড়ি–বাড়ি করছেন, না হয় বিভিন্ন উপায়ে বিনিয়োগ করছেন, কিংবা শুধুমাএ ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে ফেলে রাখছেন। ব্যাংক আবার সেই টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ করছে।

এখন আমরা যদি দেশ থেকে পুরোপুরি দুর্নীতি দমন করতে চাই তাহলে প্রথমেই বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের নজরদারী বাড়াতে হবে যেন এই ধরণের কালো টাকার লেনদেন ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

যেমন সরকার যদি নিয়ম করে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে সেই বিনিয়োগের টাকার উৎস কি তা জানাতে হবে, তাহলে সেই শিল্প মালিক এমন কোন টাকা বিনিয়োগ করতে পারবনে না যা তিনি আগে নথিভুক্ত করেননি[১০]।

আবার বাংলাদেশের ব্যাংকগুলিতে এমন কোন নিয়ম নেই যে, কোন গ্রাহক যদি বিরাট অঙ্কের টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করতে চান, তাহলে তাকে এর উৎস বলতে হবে এবং বছর বছর এই টাকার ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তাই এই নিয়মটি যদি করা হয় এবং প্রতি বছর এর আপডেট করা হয়, তাহলে গ্রাহকদের পক্ষে কর না দিয়ে কোন আয় ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে রাখা সম্ভব হবে না।

একইভাবে বিভিন্ন নিয়ম করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকৃত টাকার উৎসও যদি জিজ্ঞেস করা শুরু হয়, তাহলে পুঁজিবাজারে কালো টাকার লেনদেন ধীরে ধীরে কমে আসবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ তো আগে অনেকবার দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া কখনোই পাওয়া যায়নি। তাহলে এই সুযোগ দেয়ার তো কোন মানে নেই।

এর উত্তর জানতে হলে পাঠকদেরকে একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের সাথে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার পন্থার যোগসূত্র সম্পর্কে জানতে হবে।

কালো টাকা – সাদা টাকা এবং দুর্নীতি দমন অভিযান

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার আদৌ কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের উপরে। এই সুযোগটির কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে তখনই যখন মানুষ এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করবে। এই সুযোগটি দেয়ার পরও মানুষ যদি কাজে না লাগায়, তাহলে এই সুযোগটির কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। তখন এই সুযোগটি দিলেও যা হবে, না দিলেও তা হবে। তাই ব্যাপারটি নিয়ে কোন প্রকার আলোচনারও কোন মানে নেই।

আবার মানুষ এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করবে তখনই যখন মানুষের মনে কালো টাকা নিয়ে ভীতি কাজ করবে। এই ভীতি সৃষ্টি হবে যদি সরকার কার পকেটে কতো কালো টাকা আছে, সেই তথ্য তালাশ করতে থাকে যা কিনা একমাত্র দুর্নীতি দমন অভিযানের মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ কার কাছে কতো কালো টাকা আছে, সরকার যদি সেই হিসাব

[১০] এই নিয়মটি বাংলাদেশে আছে, কিন্তু এর প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বরং আমার মতে শিথিল এই নিয়মের কারণে সরকারি অফিসারদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরী হচ্ছে এবং তারা আরো দুর্নীতিতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

নেয়া শুরু করে এবং কালো টাকা পাওয়া মাত্রই শাস্তি দিতে থাকে, শুধু তাহলেই মানুষের মনে সঞ্চিত কালো টাকা নিয়ে ভীতির সৃষ্টি হবে।

তাই এই ধরণের অভিযান যতোই মানুষের মনে কালো টাকা নিয়ে ভীতি বাড়াবে, মানুষ ততোই তার সঞ্চিত কালো টাকা সাদা করার প্রতি মনোযোগী হবে। ফলে এই সুযোগটির সদ্ব্যবহারের হার বাড়বে। তাই এই সুযোগটির অর্থনৈতিক গুরুত্বও তখন বাড়বে।

তাই কালো টাকা সাদা করার পক্ষে-বিপক্ষে বিজ্ঞজনদের অহেতুক আলোচনা এবং লেখালেখি বাদ দিয়ে তাদের উচিত সবার প্রথমে একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের দাবী তোলা। কারণ একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া এই সুযোগটির ব্যাপারে আলোচনার কোন অর্থ নেই।

আমার এই কথার প্রমাণ পাওযা যাবে বিগত দিনগুলিতে।

বাংলাদেশ সরকার অতীতে অনেকবার এই সুযোগটি দিয়েছে, কিন্তু কোনবারই মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে প্রতিবারই কালো টাকা সাদা হওয়ার পরিমাণ ছিল খুবই কম। এর কারণ প্রতিবারই সরকার এই সুযোগটি দিয়েছে কোন প্রকার দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়াই। এই কারণে মানুষের মনে কালো টাকা নিয়ে কোন প্রকার ভীতি কাজ করেনি। ফলে মানুষও কালো টাকা সাদা করেনি।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তো এই সুযোগটি দেয়ার পাশাপাশি একটি আগ্রাসী দুর্নীতি দমন অভিযানও চলছিল। তাহলে সেই সময়েও কেন মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত মানে সাড়া পাওয়া যায়নি ?

আমি এর উওরে বলব, বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মানুষ অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি কালো টাকা সাদা করেছে, কিন্তু তা প্রত্যাশিত পরিমাণে হয়নি। এর মূল কারণ তখন একটি দুর্নীতি দমন অভিযান চলা সত্বেও সেই সময় অপ্রদর্শিত আয় এবং কালো টাকাকে আলাদা করে দেখা হয়েছিল এবং বৈধ এবং অবৈধ আয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা টানা হয়েছিল। এই ব্যাপারটি মানুষের মনে এক প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সেই বিভ্রান্তির কারণেই মানুষ দলে দলে কালো টাকা সাদা করেনি।

এই ব্যাপারটি যে কতোটা বিভ্রান্তিকর ছিল তা বোঝানোর জন্য নীচের ছোট্ট উদাহরণই যথেষ্ট।

ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী আন্ডার ইনভয়েস করে আমদানী কর ফাঁকি দিয়ে কাঁচামাল আমদানী করেছেন। পরে সেই কাঁচামালের সাথে ভেজাল মিশিয়ে পণ্য বানিয়ে বাজারে বিক্রি করেছেন এবং আয় করেছেন। আবার সেই আয় সরকারের কাছে গোপনও করেছেন। তাহলে তার এই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ পথে উপার্জিত, নাকি অবৈধ পথে উপার্জিত?

আবার ধরা যাক একজন সরকারি কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার করে টাকা আয় করে তার ভাই এবং স্ত্রীর নামে একাধিক এপার্টমেন্ট কিনেছেন এবং সেগুলি থেকে প্রতি মাসে ভাড়া পাচ্ছেন। সেই ভাড়া বাবদ তার আয় তিনি আবার সরকারের কাছে গোপন করেছেন। তাহলে তার এই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ পথে উপার্জিত, নাকি অবৈধ পথে উপার্জিত?

কালো টাকা এবং অপ্রদর্শিত আয়কে যদি আলাদা করে দেখা হয় এবং বৈধ এবং অবৈধ আয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা টানার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা আয়কর আদায়ের জন্য সরকারের নৈতিক অবস্থানকেই দুর্বল করে দেবে। কারণ নিয়ম মতে যে কোন বৈধ আয়কেই সরকারের কাছে প্রকাশ করতে হবে। তা যদি না করা হয়, তাহলে সেই আয় অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। ফলে এই ধরণের অবৈধ আয়ের বিপরীতে যে কোন প্রকার জরিমানা ধার্য করার অধিকার সরকারের সবসময়ই থাকবে।

কিন্তু এখানে যদি অবৈধ আয়কে বৈধ পথে উপার্জিত বলে ব্যাপারটিকে হালকা করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সরকার এই আয়কে বৈধ করার জন্য জরিমানা বা শাস্তির বিধান করার নৈতিক অবস্থান হারাবে। ফলে ভবিষ্যতে এই ধরণের অবৈধ আয়কে বৈধ করার জন্য কোন প্রকার জরিমানা না দেয়ারও দাবী উঠবে। এই দাবী সাম্প্রতিক অতীতে উঠেছে। এর মূল কারণ এই অবৈধ আয়কে ইতিমধ্যে বৈধ পথে উপার্জিত বলে দাবী করা হয়েছে, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ দেয়া হয়নি।

এই প্রমাণ আসলে কেউই এখন দিতে পারবেন না। কারণ একজন ব্যবসায়ী তার অপ্রদর্শিত আয় তার বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন করেছেন, নাকি অবৈধ হুন্ডির মাধ্যমে অর্জন করেছেন, তার আর এখন কোন প্রমাণ নেই। কারণ এই আয়টি যে বৈধ, তার একমাএ প্রমাণ তার ট্যাক্স রিটার্ন যা তিনি সময়মতো দাখিল করেননি। এখানে বলা দরকার সকল অবৈধ ব্যবসায়ীরই সমাজে একটি বৈধ ব্যবসাও রয়েছে। তারা এই অবৈধ ব্যবসাগুলি করেন মূলত এই বৈধ ব্যবসার আড়ালে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় বৈধ আয় এবং অবৈধ আয়ের সীমারেখা এতোটাই জটিল যে এরকম সীমারেখা টানাটাই আসলে বোকামি। বিগত সরকারের বৈধ-অবৈধ আয়ের মধ্যে

এই সীমারেখা টানার চেষ্টার কারণেই মূলত ব্যবসায়ীরা যেমন দলে দলে তাদের অপ্রদর্শিত আয়কে সাদা করেননি, তেমনি এই টাকা তারা বিনিয়োগও করেননি। ফলে দেশে তখন এক ধরণের বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে সরকার **বেটার বিজনেস ফোরাম** গঠন করতে বাধ্য হয় এবং অবশেষে দুর্নীতি দমন অভিযান থামিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপরের প্রস্তাবনাগুলি কতটুকু বাস্তবসম্মত, তা আলোচনা করার আগে আমাদেরকে কর ফাঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রথমে চিনতে হবে।

কর ফাঁকি কারা দিচ্ছেন?

আমাদের দেশে যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাদেরকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. বড়, মাঝারি, কিংবা ছোট ব্যবসায়ী কিংবা প্রতিষ্ঠান যাদের TIN আছে কিন্তু যারা নিজেদের আয় কম করে দেখাচ্ছেন।
২. বড়, মাঝারি, কিংবা ছোট ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান যাদের TIN আছে কিন্তু সেই নাম্বারটি আবার নকল।
৩. বিভিন্ন সেক্টরের পেশাজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যাদের TIN আছে কিন্তু করযোগ্য আয় থাকা সত্ত্বেও ঠিকমতো কর দিচ্ছেন না।
৪. গ্রামে-গঞ্জে, বড় কিংবা মফস্বল শহরগুলির অনেক বড়-ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ী, ব্যক্তি কিংবা পেশাজীবী যারা ভালো আয় করছেন কিন্তু কোন কর দিচ্ছেন না কারণ তাদের কোন TIN ই নেই।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংখ্যার দিক থেকে করফাঁকি দেয়া ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানগুলির মধ্যে খুব সম্ভবত চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এদের অনেকে আসলে জানেনই না যে প্রতি বছর তাদেরকে সরকারের কাছে কর জমা দিতে হবে। আবার টাকার অঙ্কে করফাঁকি দাতাদের মধ্যে খুব সম্ভবত প্রথম শ্রেণীটিই সবচেয়ে বড়।

এই চারটি শ্রেণীর সম্মানিত নাগরিকরা যারা করফাঁকি দিচ্ছেন কিংবা আদৌ কর দেয়ার জন্য নিবন্ধিত হননি, তারা তাদের বেঁচে যাওয়া টাকা বিভিন্নভাবে খরচ করছেন, বিনিয়োগ করছেন, আবার অনেকে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে জমিয়ে রাখছেন।

এখন দুর্নীতি দমন অভিযানের শুরুতেই যদি সরকার দুর্নীতিবাজ ধরার দ্বিতীয় কৌশলটির প্রয়োগ করে, তাহলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন সেই সকল সম্মানিত

করফাঁকিবাজরা যারা তাদের অপ্রদর্শিত আয় সরাসরি খরচ বা বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে ফেলে রেখেছেন। কারণ ব্যাংকে রাখা অপ্রদর্শিত আয়ের হিসাব নেয়াটাই সরকারের জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ।

সরকার যদি আগামী কাল থেকে ব্যাংকগুলিতে এবং বিনিয়োগ নিবন্ধন প্রতিষ্ঠানগুলিতে হঠাৎ করে আয়ের সুএ দাবী করা শুরু করে, তাহলে যারা যুগ যুগ ধরে তাদের সঞ্চিত টাকা ব্যাংকে জমিয়ে রাখছেন, তাদের টাকার কি হবে?

এখন ধরা যাক, এই সকল ব্যক্তিরা সরকারের কড়া নিয়ম কানুনের কারণে আজ থেকে তাদের আয় আয়কর বিভাগের কাছে প্রকাশ করা শুরু করলেন এবং সেই টাকা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু সেই টাকার কি হবে যে টাকা তারা কর না দিয়ে এতোদিন ব্যাংকে ফেলে রেখেছেন? ব্যাংক যখন সরকারের নিয়ম মানতে গিয়ে এই টাকার সুএ দাবী করবে তখন তারা কি করবেন?

ফলে এই সকল সম্মানিত করফাঁকিবাজরা তখন পড়ে যাবেন বিপদে। তারা তখন স্বভাবতই চাইবেন কোন না কোনভাবে এই টাকাকে বাইরে পাচার করে দিতে। ফলে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর হারাবে এক বিরাট সঞ্চয় যা এতোদিন বিভিন্ন উপায়ে দেশের কাজে লাগছিল, সেই সাথে দেশও সুযোগ হারাবে এই সকল টাকার উৎপাদনশীল খাতের বিনিয়োগ হতে।

আইএফডি'র প্রস্তাবনা

তাই এই ধরণের একটি পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সরকার দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু করার সাথে সাথে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার একটি পথ খুলে দিতে পারে। ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর বা জরিমানা দিয়ে সম্মানিত করফাঁকিবাজরা তাদের সঞ্চিত অবৈধ অর্থ বৈধ করতে পারেন। কিন্তু এই জরিমানার হার যদি কম হয় তাহলে অতি সম্মানিত সৎ করদাতারা বৈষম্যের শিকার হতে পারেন[১১]। তাই তাদেরকে বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচাতে এই জরিমানার হার হতে হবে স্বাভাবিক কর হারের চেয়ে বেশি।

কিন্তু এই ধরণের উচ্চহার যদি আরোপ করা হয়, এবং সেই সাথে একটি কার্যকর দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো হয়, তাহলে সম্মানিত করফাঁকিবাজরা কি দলে দলে তাদের সঞ্চিত অর্থ বৈধ করবেন?

[১১] যারা জীবনে রোজগারের প্রতিটি পয়সার হিসাব সরকারের কাছে দিয়েছেন, এবং কোনদিন এক টাকাও করফাঁকি দেননি, তারাই অতি সম্মানিত সৎ করদাতা।

না, করবেন না।

এর কারণ বাংলাদেশ টাকা অবৈধভাবে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার সুযোগ এতোটা উন্মুক্ত যে, এই ধরণের একটি পদক্ষেপ বরং উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে। তাই লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশে সরকারি মহলের দুর্নীতিকে কাজে লাগিয়েই এই টাকা পাচারের ঘটনাগুলি ঘটে। তাই সরকারি মহলে দুর্নীতি দমন করা না গেলে টাকা পাচারের ক্ষেত্রও কোনদিন বন্ধ হবে না।

তাই সমাজ থেকে দীর্ঘমেয়াদে দুর্নীতি দমনের স্বার্থে নীচের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু করার পাশাপাশি ব্যাংকে জমিয়ে রাখা এই ধরণের অপ্রদর্শিত আয় নিয়ে যাতে সম্মানিত করফাঁকিবাজরা আতঙ্কে না ভোগেন, সেই জন্য অপ্রদর্শিত নগদ অর্থকে বৈধ করার একাধিক রাস্তা খুলে দিতে হবে।

এই বৈধ করার পন্থা হতে পারে বিভিন্ন রকমঃ

১. কোন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নগদ অর্থ বৈধ করতে চান, তাহলে তাকে এই অর্থের উপরে উচ্চহারে কর দিতে হবে। এই করের হার কাজ করবে জরিমানার মতো। তাই আগে যারা সঞ্চিত অর্থের কর দেননি, তারাও জরিমানা দিয়ে তাদের অবৈধ অর্থ বৈধ করবেন। এই উচ্চহার হতে পারে স্বাভাবিক কর হারের চেয়ে অন্তত ৫-১০% বেশি।

২. কোন ব্যক্তি যদি এই টাকা সরাসরি নির্মাণ শিল্পের উৎপাদনশীল খাতে (যেমন নতুন ফ্ল্যাট, দোকান, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি) বিনিয়োগ করেন, তাহলে এই অর্থের উপর জরিমানার হার হবে স্বাভাবিক হারের চেয়ে তুলনামূলক কম, যেমন ১৫-২০%। তবে জমি কেনা-কাটাতে এই অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। কারণ শুধুমাত্র জমির লেনদেনে দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ে না।

৩. কোন ব্যক্তি যদি সরাসরি নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে তাদের এই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করতে চান, তাহলে জরিমানার হার হবে আরো কম, যেমন ১০% মাত্র।

এক্ষেত্রে সরকার যদি আইপিও[১২] বা প্রাথমিক শেয়ারের বিনিয়োগেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়, তাহলে সাধারণ মানুষও তাদের সঞ্চিত কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে সরকার নিয়ম করতে পারে এই ধরণের নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত হতে হবে।

৪. সম্মানিত করফাঁকিবাজরা যদি সরকারের কোন প্রকল্পে (যেমন পিপিপি) বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের অবৈধ অর্থ বৈধ করতে চান, তাহলে তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে আরো কম, যেমন ৫%।

এইভাবে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি মানুষকে অপ্রদর্শিত আয়ের ব্যাপারে সাবধান করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে অপ্রদর্শিত আয় থাকলে ভবিষ্যতে কি কি ধরণের অসুবিধায় পড়তে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে পারে। সরকার যদি অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করে হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে চায়, তাহলে এর জন্য প্রস্তুতি বাবদ একশত কোটি টাকা প্রচারণা খাতে ব্যয় করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আগেই বলা হয়েছে, সরকার অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার এই কর হার ধীরে ধীরে বাড়াতে পারে। সেই সাথে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকরভাবে কালো টাকার ব্যাপারে ভয় দেখানো বাড়াতে পারে। তাই ভয় পেয়ে মানুষ আগেভাগেই কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করতে উৎসাহ বোধ করবে। এই রকম একই ধারার দুর্নীতি দমন অভিযান চলতে থাকলে এমন একটি সময় আসবে যখন দেশের অর্থনীতিতে আর কোন অপ্রদর্শিত আয় থাকবে না। তাই সরকারের তখন উচিত হবে অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণের এই পন্থাটি চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা।

কর হারের ভিন্নতার যৌক্তিকতা

উপরের প্রস্তাবে নগদ অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার জন্য সবচেয়ে বেশি করের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মূল কারণ নগদ অপ্রদর্শিত আয়ের বৈধ করার কর হার যদি কম হয়, তাহলে যারা নিয়মিত ঠিক মত কর দিচ্ছেন, তারা বৈষম্যের শিকার হবেন। ফলে তারা আর ঠিক মত কর দিতে উৎসাহ পাবেন না।

[১২] সরকারের নজরদারীর অভাবে পুঁজি বাজারে কালো টাকার বিনিয়োগ প্রতিনিয়তই হচ্ছে। তাই সরকার যদি এই ব্যাপারে নজরদারী বাড়ায়, তাহলে সেকেন্ডারী মার্কেটে এই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ করে শুধুমাত্র আইপিও বা প্রাথমিক শেয়ারে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই কালো টাকা সাদা করতে দেয়া উচিত।

আবার সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যাদের পক্ষে কোন নতুন বিনিয়োগে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারের উচিত, এই সকল ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে নগদ অপ্রদর্শিত অর্থ উচ্চ হারে জরিমানার মাধ্যমে বৈধ করার সুযোগ দেয়া।

দ্বিতীয় ধাপে নির্মাণ শিল্পে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করলে কর হার কিছুটা কম রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে যাদের অপ্রদর্শিত আয় রয়েছে, তারা তখন আর নগদ টাকা বৈধ করে সেই টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখবেন না। বরং তারা এই টাকা বৈধ করবেন নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই ধরণের বিনিয়োগ বাড়লে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বাড়বে কারণ নির্মাণ শিল্পের একটি বড় অবদান আছে জাতীয় আয়ে।

আবার সরাসরি শিল্প বিনিয়োগে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার কর হার প্রস্তাব করা হয়েছে আরো কম। এই কম কর হারের কারণে অপ্রদর্শিত আয়ের মালিকরা সরাসরি শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবেন। এখানে উল্লেখ্য, এই পুরো প্রস্তাবনাতে শুধুমাএ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সকল বিনিয়োগই যদি নির্মাণ শিল্পে হয়, তাহলে নির্মাণ শিল্পে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ হয়ে যেতে পারে যা দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই কারণে সকল অপ্রদর্শিত আয়ের বিনিয়োগ যাতে নির্মাণ শিল্পে না হয়, এর জন্য অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের কর হার আরো কম প্রস্তাব করা হয়েছে।

সর্বশেষে, কেউ যদি সরকারি কোন প্রকল্পে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈধ করতে চান, তাহলে এর বিপরীতে আরো কম কর হার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর কারণ সরকারি বিনিয়োগে দীর্ঘসুএীতা রয়েছে। তাই এই জরিমানার হার কম রাখা না হলে বিনিয়োগকারীরা সরকারি বিনিয়োগে উৎসাহী না-ও হতে পারেন।

বিগত বাজেটে বর্তমান সরকার বেশ কয়েকটি খাতে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দিয়েছে তিন বছরের জন্য। এর বিনিময়ে একজনকে কর গুনতে হবে ১০%। এখানে খাতওয়ারী করহারের কোন ভিন্নতা রাখা হয়নি।

তাহলে প্রশ্ন হল, কেউ যদি তথ্য প্রযুক্তি কিংবা মেলামাইন শিল্পে বিনিয়োগ করে দুই বছরের মাথাতেই রিটার্ন পাওয়া শুরু করতে পারে, তাহলে এই ধরণের বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘসুত্রীতার পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে যাবেন কেন ?

আবার, এটাও বলা দরকার, সকল কালো টাকার মালিকদের আরেক পকেটে কিন্তু আবার সাদা টাকাও আছে। তাই কালো টাকার সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি না করে এই সুযোগ দিলে বিনিয়োগকারীরা তাদের সাদা টাকা দিয়েই এই বিনিয়োগটি করবেন। কারণ তারা

খামাখা কালো টাকা ফিক্সড ডিপোজিট থেকে তুলে এনে জরিমানা দিয়ে বিনিয়োগ করতে যাবেন কেন ? তারা তো তাহলে বছর বছর ব্যাংক থেকে যে সুদ পাচ্ছেন, তা হারাবেন। তাই একটি কার্যকরী দুর্নীতি অভিযান বিহীন এই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার পথ খুলে দেয়ার আসলে কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই যা আগেই বলা হয়েছে।

সাবধানতা

শিল্পায়নের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার পথ খুলে দিলে অসৎ ব্যবসায়ীরা তাদের প্রকল্পের খরচ বেশি দেখিয়ে তাদের অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করে ফেলবেন, কিন্তু আদতে প্রকৃত বিনিয়োগ হতে পারে কম। অসৎ ব্যবসায়ীদের এই ধরণের প্রবণতা রোধ করার দায়িত্ব অডিটরদের। তারা যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তার দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

দুঃখজনকভাবে বিগত বছরগুলিতে অডিটরদের জবাবদিহিতা বিষয়ে খুব একটা কথা বার্তা শোনা যায়নি। অডিটরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযানও চালানো হয়নি। অথচ অভিযোগ রয়েছে এক শ্রেণীর অডিটররা নাকি বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে করফাঁকিতে সাহায্য করেন। তাই সরকারের উচিত এই সকল অসৎ অডিটরদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় আনা। এই সম্পর্কে অডিটরদের জবাবদিহিতা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পড়ুন পরবর্তী সেকশনে।

বিনিয়োগ বোর্ডও একটি নির্দিষ্ট সময় পর এই সকল বিনিয়োগের অডিট করতে পারে। ফলে কোন ব্যবসায়ী বিনিয়োগে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছেন, এমনটি ধরা পড়লে তার লাইসেন্স সরকার বাতিল করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে কড়া মনোভাব দেখাতে হবে।

সরকার নিয়ম করতে পারে এই সকল বৈধ করা টাকায় তৈরী কোম্পানিগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর স্টক মার্কেটে নিবন্ধিত হতে হবে। ফলে বিনিয়োগ যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি স্টক মার্কেটেও তারল্য বাড়বে।

অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার পথ খুলে দেয়ার পাশাপাশি সরকারকে বিনিয়োগের সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা সহজে তাদের টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। এর জন্য সরকার বেশ কয়েকটি ফান্ড গঠন করতে পারে, যেমনঃ

১. পাওয়ার সেক্টর ডেভলপমেন্ট ফান্ড
২. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফান্ড

৩. এডুকেশন সেক্টর ডেভলপমেন্ট ফান্ড
৪. রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ফান্ড

এই সকল ফান্ড গঠন করার পাশাপাশি সরকারকে এই ফান্ডগুলির মাধ্যমে কি ধরণের প্রকল্প তৈরী করা হবে, এবং সেই প্রকল্পগুলির লভ্যাংশ কেমন হবে তার একটি আগাম ধারণা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আগেভাগেই জানিয়ে দিতে হবে।

ফলে বিনিয়োগকারীরা যদি এই সকল প্রকল্পগুলির গুণাগুণ বিচার করে এই সকল ফান্ডে ৫% হারে কর দিয়ে তাদের অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করেন, তাহলে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়বে। এই ধরণের ফান্ড গড়ার পরামর্শটি এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে।

অডিটরদের জবাবদিহিতা[১৩]

অডিটরদের জবাবদিহিতা বিষয়ে আলোচনার আগে এই পেশার গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা দরকার।

কোন একটি কোম্পানি যখন তাদের হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করে, তখন এই হিসাব নিকাশগুলো সঠিক নিয়ম মেনে করা হয়েছে কিনা, কিংবা তাতে কোন ভুল ভ্রান্তি রয়েছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য একটি তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। অডিটররা হলো এই তৃতীয় পক্ষ যারা স্বাধীন পেশাজীবী হিসাবে কাজ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে একটি কোম্পানির হিসাব নিকাশ যাচাই বাছাই করেন। তাদের এই কার্যক্রমকে বলা হয় অডিট (Audit)। প্রতিটি অডিট পরবর্তীতে এই পেশাজীবীরা কোম্পানিটির হিসাব সম্পর্কে তাদের স্বাধীন মতামত বা অডিট অপিনিয়ন (Audit Opinion) প্রদান করেন যা দেখে অন্যান্যরা বুঝতে পারেন এই কোম্পানিটির হিসাব সঠিক আছে কিনা।

যেমন, সরকারের দেখার বিষয় হল প্রতিটি কোম্পানি তাদের আয় এবং ব্যয় ঠিকমতো দেখাচ্ছে কিনা, এবং সঠিকভাবে কর প্রদান করছে কিনা। তাই অডিটররা যদি মত দেন যে পরীক্ষিত কোম্পানিটির হিসাব নিকাশ সঠিক নিয়ম মেনে করা হয়েছে এবং তাতে কোন অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া হয়নি, তাহলে সরকার পক্ষ ধরে নেবে এই কোম্পানিটির হিসাব বিবরণী সঠিক এবং তারা যে কর দিচ্ছে তাতে কোন গরমিল নেই।

[১৩] এই অংশ তৈরীতে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত একটি রিপোর্টের সাহায্য নেয়া হয়েছে। রিপোর্টটির শিরোনাম "**Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) – Bangladesh – Accounting and Auditing**। রিপোর্টটি তৈরী করেছেন মি. জুবায়দুর রহমান এবং মিজ সুরাইয়া জান্নাত। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালের মে মাসে।

একইরকমভাবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা যখন একটি কোম্পানির হিসাব পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তারা প্রথমেই দেখেন এই হিসাব সম্পর্কে অডিটরদের মতামত কি। অডিটরদের মতামত যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে তারাও ধরে নেন, ডিভিডেন্ট প্রদানে কোম্পানিটি কোন প্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়নি।

অডিটররা একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ হিসাবে কাজ করেন বলে কর্পোরেট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই পেশাজীবীদের গুরুত্ব অত্যধিক। অডিটরদের কার্যক্রমের পরিধি কি হবে, তারা কোন কোন দায়িত্ব পালন করবেন, তা ঠিক করার জন্য প্রতিটি দেশেই একটি নির্দিষ্ট সংস্থা বা বডি রয়েছে যারা অডিটরদের এই কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটির নাম The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh বা সংক্ষেপে ICAB।

প্রতিটি দেশেরই অডিটরদের কর্মপরিধি নির্ধারণে একটি নির্দিষ্ট মান বা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে যাতে বলা আছে একজন অডিটরের দায়দায়িত্ব কি কি। বাংলাদেশের এই স্ট্যান্ডার্টটির নাম Bangladesh Standards on Auditing। সারা বিশ্বে অডিটরদের দায়দায়িত্ব যেন একই রকম থাকে সেজন্য আবার বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ডও রয়েছে। প্রতিটি দেশই এই বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিলিয়ে নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড আপডেট করে।

বাংলাদেশে অডিটররা তাদের এই পেশাগত দায়িত্ব কতটুকু ন্যায়নীতির সাথে পালন করছেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অভিযোগ রয়েছে এমন অনেক অডিটর রয়েছেন যারা তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য কোম্পানি মালিকদের সাথে যোগসাজশ করে ভুল ভ্রান্তি দেখেও না দেখার ভান করেন এবং ব্যাপক গরমিল থাকা সত্বেও কোম্পানির হিসাব বিবরনী সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশের সরকারের যেহেতু অডিটরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোন বলিষ্ঠ কার্যক্রম নেই, সেহেতু এই অডিটররা তাদের অডিট করেন কোম্পানি মালিকপক্ষের দেখিয়ে দেয়া নিয়ম মেনেই।

বাংলাদেশে অডিটরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ICAB'র থাকলেও এই সংস্থাটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু পালন করছে তা নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের অডিটরদের কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড যদিও আছে, কিন্তু অডিটররা এই স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবে কতটুকু পালন করছেন, তা নিয়ে কোন প্রকার নজরদারী এই সংস্থাটির নেই। ফলে অডিটররাও তাদের অডিট করছেন অনেকটা ফ্রি স্টাইলে।

তাই এই সকল অডিটরদের স্বাধীন থাকার কথা থাকলেও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বা Independent নন, বরং পরাধীন বা Dependent।

তাই এই পরাধীন অডিটরদের মন্তব্য বা অডিট অপিনিয়নের আসলে কোন প্রকার মূল্য নেই। তাই সরকারের উচিত এই সকল পরাধীন বা Dependent অডিটরদের চিহ্নিত করে তাদের মূল্যহীন ব্যবসা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি কালো টাকার প্রবাহ কমাতে হয়, তাহলে সবার আগে অডিটরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে অর্থনীতিতে কালো টাকার প্রবাহ কোনদিন কমবে না। কারণ কালো টাকা সৃষ্টির পিছনে এই সকল অসৎ শ্রেণীর অডিটরদের অবদানও কম নয়।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার বিপক্ষে যুক্তি

অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার বিপক্ষে বেশ অনেকগুলি যুক্তি দেখানো হয়। এই যুক্তিগুলি আমি একে একে তুলে ধরছি এবং তার বিপরীতে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছিঃ

১. অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করা অনৈতিক

অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করা অনৈতিক, এই যুক্তিটি প্রথম জোরেসোরে উচ্চারিত হয় ২০০৫ সালের বাজেটের পর। তখন সরকার অপ্রদর্শিত আয়কে ৭.৫% করের মাধ্যমে বৈধ করার প্রস্তাব দিলে এর প্রতিবাদে সর্বমহলেই নিন্দার ঝড় ওঠে। তখন সবচেয়ে বড় যে যুক্তি দেখানো হচ্ছিল তা হল এইভাবে কালো টাকা সাদা করা অনৈতিক।

তবে ২০০৭ সালে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। তখন বলা হতে থাকে, বৈধ পথে উপার্জিত অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করা নৈতিক, কিন্তু অবৈধ পথে উপার্জিত কালো টাকা সাদা করা অনৈতিক।

২০০৮ সালের শেষে এবং ২০০৯ সালের শুরুতে এই পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়। তখন অবশ্য সমাজের বিজ্ঞজনদের একটি বিরাট অংশ কালো টাকা সাদা করাকে আর অনৈতিক বলেননি। তারা তখন কোন বৈধ-অবৈধ সীমারেখা টানারও চেষ্টা করেননি।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাজেট অধিবেশনের আগে এবং পরে প্রিন্ট মিডিয়া এই পন্থাটিকে অনৈতিক বলে আবারো প্রচারণা চালায়। ফলে পরিস্থিতির আবার অবনতি হয়। সবাই তখন এই পন্থাটিকে আবার অনৈতিক বলা শুরু করেন।

এখন প্রশ্ন হল, একটি কাজকে চার বছর আগে অনৈতিক বলা হল, এর দুই বছর পর তার স্বপক্ষে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া হল, আবার বছর যেতে না যেতেই সেই একই পন্থাকে আবারো অনৈতিক বলা হচ্ছে কেন? এই নৈতিকতার মানদন্ড তা হলে কি?

আশ্চর্যজনকভাবে এই বিষয়টির উপর আসলে কেউই আলোকপাত করেননি !

যেহেতু নৈতিকতার যুক্তিতে কালো টাকা সাদা করার বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে, সেহেতু আমি নীচে এই বিষয়টির সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত বিষদভাবে ব্যাখ্যা করছি।

একটি কাজ নৈতিক, নাকি অনৈতিক, এই বিতর্কে যদি আমরা জড়িয়ে যাই তাহলে আমাদেরকে সবচেয়ে প্রথমে রেফারেন্স দিয়ে বলতে হবে এই কার্জটিকে কোথায় নৈতিক বা অনৈতিক বলা হয়েছে। এর জন্য সবার আগে আমাদেরকে তাকাতে হবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দিকে, কারণ এই ধর্মগ্রন্থগুলিই মানুষকে সর্বপ্রথম শিক্ষা দিয়েছে কোন কাজটি নৈতিক, এবং কোন কাজটি অনৈতিক।

যুগে যুগে অসংখ্য নবী, রাসুল আবির্ভুত হয়েছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, এবং তাদের উপর এই সকল ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ নাজিল করেছেন মানবজাতির বিভিন্ন সময়কালে। যেমন, ধর্মগ্রন্থ নাজিল হওয়ার ধারাবাহিকতায় বনী ইসরাইলদের জন্য নাজিল হয়েছে পবিএ তাওরাত, এবং তাদের পরবতী বংশধরদের জন্য নাজিল হয়েছে পবিএ ইনজিল যা পরবতীতে পবিএ বাইবেল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে এবং সর্বশেষ নাজিল হয়েছে পবিএ কোরআন।

এই তিনটি মুল ধারার ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এর সঠিক সংখ্যা এবং ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই ধর্মগ্রন্থগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর নাজিল হলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক অনেক মিল রয়েছে। এর থেকে যে কেউই বুঝতে পারবেন, এই প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের মুল সুএ আসলে এক।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর নাজিল হওয়া এই সকল ধর্মগ্রন্থগুলিই সর্বপ্রথম ঠিক করেছে নৈতিকতার বিভিন্ন মানদন্ড। আমরা মানুষ হত্যাকে পাপ মনে করি, কারণ আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতেই এই কাজটিকে পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটা যদি উল্লেখ করা না থাকতো তাহলে আমরা মানুষ হত্যাকে আর পাপ মনে করতাম না যেমন মনে করতো না মক্কার অধিবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নব্যুয়তের আগে।

তারা কন্যা সন্তান হওয়াকে অভিশাপ মনে করতো এবং এই কারণে বাবা'রা কন্যা সন্তান হলে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত এবং মনে করতো এতে অনেক পুণ্য হয়েছে। এর কারণ তারা তাদের মুল নৈতিকতার মানদন্ড হারিয়ে ফেলেছিল এবং নিজেদের মনগড়া নৈতিকতার মানদন্ড তৈরী করেছিল এবং তারই অনুসরণ করছিল।

তবে ধর্মগ্রন্থগুলিতে মুল বিষয়গুলির উল্লেখ থাকলেও প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ নেই। যেমন, রাস্তায় লাল বাতি জ্বললে যে থামতে হবে, তার কোন উল্লেখ কোন ধর্মগ্রন্থতে পাওয়া যাবে না। এর কারণ ধর্মগ্রন্থগুলিতে শুধুমাএ সেই সকল বিষয়ই মূলত স্থান পেয়েছে যে সকল ক্ষেএে মানুষের ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে, কিংবা যে সকল সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে মানুষ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। অন্যান্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার মানুষের উপরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এই কারণে মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে ধর্মগ্রন্থের দিকনির্দেশনার বাইরেও বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে জীবনকে সুন্দর করার জন্য। গাড়ি যখন আবিস্কৃত হয়েছে তখন তার পথ চলার নিয়ম কানুন ঠিক করা হয়েছে, আবার সেই নিয়ম ভাঙলে কি শাস্তি হবে, তাও বলে দেয়া হয়েছে। মানুষের এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তর যখন শুরু হয়েছে, তখন এই ধরণের স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাসপোর্টের আবির্ভাব হয়েছে।

মানবসৃষ্ট এই সকল আইনের আবার সময় সময় পরিবর্তনও হও। মানুষের চাহিদার দিকে নজর রেখে এই পরিবর্তনগুলি আনেন প্রত্যেকটি দেশের শাসক। যেমন আগামী কাল যদি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন, রাস্তায় লালবাতি বলে কিছু থাকবে না, এর বদলে নীল বাতি জ্বলবে, এবং নীল বাতি জ্বললে থামতে হবে, তাহলে আমাদের সবাইকেও তাই মানতে হবে। ফলে সিগন্যাল লাইটে উঠে যাবে লাল বাতি। এর বদলে আসবে নীল বাতি। এই নীল বাতি ক্রস করা হবে অবৈধ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধর্মগ্রন্থের দিকনির্দেশনার বাইরে গিয়ে সমাজে এমন অনেক মানবসৃষ্ট আইন হয়েছে যাতে একটি বিষয় বৈধ হয়েছে, আবার আরেকটি বিষয় অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এই বৈধ-অবৈধের সীমারেখা নির্ধারণে আবার ধর্মগ্রন্থেরই মুল নির্দেশনার অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন একটি কাজ বৈধ বা অবৈধ করার আগে দেখে নেয়া হয়েছে এই বিষয়টি সম্পর্কে যার যার ধর্মগ্রন্থে কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে কিনা[১৪]।

[১৪] মুসলমানদের জন্য পবিএ কোরআনের দিকনির্দেশনা ছাড়াও বৈধ-অবৈধের সীমারেখায় আরো উপাদান যুক্ত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে। এর মুল কারণ পবিএ কোরআনে যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে, কিংবা যে সকল বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি, সেই সকল বিষয় সম্পর্কে সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়মিত প্রশ্ন করতেন। ফলে রাসুল (সঃ) কেও এই সকল প্রশ্নের উওর দিতে হতো। তাই এই ধরণের উওরগুলিই পরবর্তীতে আইন হিসাবে গণ্য হতে থাকে। এই প্রশ্নগুলি যদি না করা হতো, তাহলে এই বিষয়ে কোন প্রকার উওর দেয়ারও প্রয়োজন ছিল না। ফলে এই অস্পষ্ট বিষয়গুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আমাদের উপরেই থাকতো এবং আমরাও প্রয়োজন

যেমন, বাংলাদেশে ফেন্সিডিল খাওয়া এবং এর ব্যবসা করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে অবৈধ বলে বিবেচিত। এর কারণ এই পণ্যটিকে সরকার একটি নেশাজাতীয় পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেছে। আবার নেশা যে খারাপ, সেই সিদ্ধান্তটি যদিও সরকার নিয়েছে সমাজের বিশিষ্ট জনদের মতামতের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু সামাজিক এই সিদ্ধান্তটি পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে পবিএ কোরআনের দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই।

কারণ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিএ কোরআনে যে কোন প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্যাদিকে অবৈধ এবং হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একই কারণে বাংলাদেশে লাইসেন্স ছাড়া মদ বিক্রি করা এবং পান করা অবৈধ এবং অনৈতিক যদিও পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই পণ্যের প্রকাশ্য ব্যবহারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এই অবৈধ এবং অনৈতিক কাজ করার অজুহাতে অতীতে একাধিক বিশিষ্ট জনকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থগুলিতে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি, কিন্তু সরকার তা নিষিদ্ধ করে রেখেছে। যেমন, আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ভিওআইপি ব্যবসা পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং অবৈধ ছিল। কিন্তু এই ব্যবসাটিকে কোন ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এটি নিষিদ্ধ করেছে আমাদের সরকার।

তবে বিগত সরকারগুলোর সময়ে এই নিষিদ্ধ কাজটিই করছিল বিভিন্ন ফোন কোম্পানি। খুব সম্ভবত তারা মনে করেছিল এই কাজটি যেহেতু ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ করা হয়নি, শুধুমাএ মানবসৃষ্ট আইনেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেহেতু এই কাজটি করতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে কিছুদিন পরই তাদের এই তৎপরতা ধরা পড়ে যায়। তাই মানবসৃষ্ট আইন উপেক্ষা করার কারণে শায়খ আব্দুর রহমান কিংবা বাংলা ভাইয়ের মতোই একাধিক ফোন কোম্পানির ফাঁসি না হলেও শত কোটি টাকা জরিমানা হয়ে যায়।

আবার এমন অনেক কাজ আছে যাদেরকে ধর্মগ্রন্থগুলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ সেই দিকনির্দেশনাকে অমান্য করে সেই কাজগুলিকে বৈধ করে ফেলেছে কিংবা ফেলছে। এর উদাহরণ হতে পারে সমকামীতা এবং সুদ। এই দুটি বিষয়কে অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এরই মধ্যে সমকামীতা বৈধতা না পেলেও সুদ বৈধতা পেয়েছে। ধর্মগ্রন্থভিত্তিক নৈতিকতার মানদন্ডকে অস্বীকার করে সুদকে বৈধ করার কুফল সাম্প্রতিককালে প্রতিটি দেশই কমবেশি টের পেলেও সমকামীতা বৈধ করার কুফল বুঝতে হলে আমাদের সবাইকে আরো সময় অপেক্ষা করতে হবে।

অনুসারে নিজেদের মত করে আইন তৈরী করতে পারতাম। ফলে ইসলাম ধর্ম আমাদের জন্য আরো সহজ হতো। এই কারণে অতিরিক্ত প্রশ্ন করাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পছন্দ করতেন না।

ধর্মগ্রন্থ এবং রাষ্ট্রের শাসকদের পর আরো নিম্ন পর্যায়ের নৈতিকতার মানদন্ড ঠিক করতে পারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রফেশনাল বডি। তারা তাদের পেশাগত কাজকে একটি নিয়মের মধ্যে আনার জন্য তাদের স্ব স্ব কর্মীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নৈতিকতার মানদন্ড তৈরী করতে পারে। এই ধরণের মানদন্ডগুলিকে বলা হয় সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রফেশনাল বডির নিজস্ব Code of Ethics। অনেক সময় এগুলিকে সংক্ষেপে আচরণবিধি বা Code of Conduct ও বলা হয়ে থাকে।

যেমন Chartered Financial Analyst বা CFA'দের জন্য তাদের নিজস্ব Code of Ethics রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে একজন CFA কি কি করতে পারবেন, কি কি করতে পারবেন না।

একই রকম Code of Conduct রয়েছে বিভিন্ন দেশের সরকারি এবং বেসরকারি অফিসারদের জন্যও। এই ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতার মানদন্ড আবার যুগের চাহিদার সাথে মিলিয়ে সময় সময় পরিবর্তিত হয়।

যখন এই ধরণের নীচু স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতার মানদন্ড সময়ের প্রয়োজন মেটাতে পারেনা কিংবা যুগের চাহিদা অনুযায়ী হয়না, তখন এই ধরণের Code of Conduct ভঙ্গ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এই ধরণের আইন ভঙ্গ করাই হতে পারে নৈতিক এবং বৈধ। কারণ তখন নৈতিকতার সংজ্ঞা দেখতে গিয়ে আরো উপরের স্ত রের ধর্মগ্রন্থভিত্তিক নৈতিকতার মানদন্ডকেই অনুসরণ করা হয়।

সময়ের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে সরকারি Code of Conduct ভঙ্গ করে আরো উচ্চতর ধর্মগ্রন্থভিত্তিক নৈতিকতার মানদন্ডকে অনুসরণ করার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর Code of Conduct ভঙ্গ করে মেজর জিয়াউর রহমানের নের্তৃত্বে এক দল সেনা অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী তাদের এই কর্মকান্ড ছিল অনৈতিক, অবৈধ। কিন্তু এই নিয়ম ভঙ্গ করতে গিয়ে তৎকালীন সেনা অফিসাররা মুলত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সামাজিক শিক্ষাটাই কাজে লাগিয়েছেলেন।

কারণ আমাদের ধর্মগ্রন্থে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একদল বাঙালি সেনা অফিসার আইন ভঙ্গ করলেও সেটাই ছিল নৈতিক এবং বৈধ। কারণ সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ শে মার্চের কালো রাতে সাধারণ

বাঙালিদের উপর অস্ত্র হাতে ঝাপিয়ে পড়েছিল যদিও তৎকালীন রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী এই কাজটি ছিল অবৈধ এবং অনৈতিক। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিল যেহেতু বাঙালিরা পার্শ্ববর্তী শত্রু দেশ ইন্ডিয়ার উস্কানিতে এই স্বাধীকার আন্দোলন করছে, সেহেতু তাদেরকে মেরে ঠান্ডা করাই নৈতিক।

কিন্তু এই যুক্তি দেখাতে গিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্যের কথা। তারা এটাও ভুলে গিয়েছিলেন ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল এবং জনগণের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আওয়ামী লীগই সরকার গঠনের সবচেয়ে বড় দাবীদার। অথচ তারা তৎকালীন আইন অনুযায়ী সরকার গঠনের দাবীদার আওয়ামী লীগকে বঞ্চিত করে তারা নিজেরাই সরকার চালাতে চাচ্ছিলেন যা ছিল অনৈতিক এবং অবৈধ।

ফলে এই বাস্তবতা অস্বীকার করেই তখন পাকিস্তান সরকার ২৫ শে মার্চের হত্যাযজ্ঞের অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় যদিও ক্ষমতাহীনদের উপর ক্ষমতাধরদের এই ধরণের হত্যাযজ্ঞের সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচারের একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এখানে উল্লেখ্য, যারা সেসময় অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলেন, তারা অনেক সময় বলেন আসলে মার্চ মাসের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে উর্দুভাষী এবং বিহারি নিধন শুরু হয়েছিল। তাই এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নিতেই ২৫ শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। তাই অখন্ড পাকিস্তান রক্ষার স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই অবস্থান ছিল বৈধ এবং নৈতিক।

কিন্তু এই যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চের আগ থেকেই বিহারি এবং উর্দুভাষী নিধন যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উচিত ছিল এই হত্যাযজ্ঞের নিরপেক্ষ বিচার করা। তা না করে এবং এই ধরণের হত্যাযজ্ঞের সাথে প্রকৃতই কারা জড়িত ছিল, তা খুঁজে বের না করেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের ২৫ শে মার্চের কালো রাতে নির্বিচারে বাঙালি নিধন কোন নৈতিক মানদন্ডেই গ্রহণযোগ্য ছিল না।

তাই আমার মতে সর্ব্বোচ্চ ধর্মীয় মানদন্ডে ২৫ শে মার্চ পরবর্তীতে Code of Conduct ভঙ্গ করে বাঙালি সেনা অফিসারদের এই বিদ্রোহ ছিল একটি সম্পূর্ণ নৈতিক এবং বৈধ একটি পদক্ষেপ।

১৯৭১ সালে সেনা অফিসারদের মতো একই রকমভাবে তৎকালীন সরকারের Code of Conduct ভঙ্গ করেছিলেন একাধিক সরকারি অফিসার যাদের অনেকেই পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

আকবর আলী খান, বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বর্তমান মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টা শুধু আইন ভঙ্গা করেই বসে থাকেননি, তিনি বরং মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে সরাসরি অংশ নেন এবং পরবর্তীতে সাহসিকতার জন্য বীরত্বের খেতাব অর্জন করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত হতো, তাহলে আইন ভঙ্গা করার জন্য এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য মেজর জিয়াউর রহমান সহ তার সকল সহকর্মীদের কোর্ট মার্শালে বিচার হতো এবং ফাঁসি হয়ে যেত। খুব সম্ভবত একই পরিণতি হতো আইন ভঙ্গাকারী সকল সরকারি অফিসারদেরও। তাদের সকলকেই তখন জাতীয় ভিলেইন হিসাবে চিত্রিত করা হতো এবং তারা সকলেই সমাজে পরিচিতি পেতেন 'দেশবিরোধী' হিসাবে। কিন্তু আমাদের সকলের সৌভাগ্য যে আমাদেরকে এই ধরণের পরিণতি দেখতে হয়নি।

১৯৭১ এর মতো অনেকটা একইরকম অথচ ভিন্ন একটি ঘটনা ঘটেছে অতি সম্প্রতি ঢাকার পিলখানায়।

বিগত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী একদল বিডিআর সদস্য আইন ভঙ্গা করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রায় অর্ধশত সেনা অফিসারকে হত্যা করে। তাদের দাবী ছিল তাদের উপর সেনাবাহিনীর অফিসাররা বৈষম্যমূলক আচরণ করছে এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার এবং নিপীড়ন চলছে। তাই তারা এই ধরণের অন্যায়ের অবসানের জন্য বিদ্রোহ করেছেন। কিন্তু এই দাবী পূরণ করতে গিয়ে বিডিআরের জওয়ানরা একটি অবৈধ পন্থা বেছে নেয় এবং প্রায় অর্ধশত সেনা অফিসারদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে।

এই হত্যার ঘটনাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই বুঝতে পারেন দাবী পূরণের জন্য এই ধরণের হত্যাযজ্ঞ অনৈতিক এবং অবৈধ। এই উপলব্ধি আমাদের সকলেরই হয়েছে কারণ আমাদের মনের গহীনে আমাদের ধর্মগ্রন্থ প্রদও সেই সামাজিক শিক্ষাটাই তখন কাজ করেছে যেখানে হত্যাকান্ডকে অনৈতিক বলা হয়েছে।

কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটতো যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিডিআর সদস্যদের উপর আক্রমণ করে বসতো। এই পাল্টা আক্রমণ যদি সত্যি সত্যি হতো তাহলে একটি হত্যাযজ্ঞের বদলা নিতে সংঘটিত হতো আরেকটি বিশাল হত্যাযজ্ঞ। ফলে যে সকল বিডিআর সদস্য বিদ্রোহ করেছে, আর যারা করেনি, তাদের সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করা হতো। ফলে এই সকল বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের বিদ্রোহ নৈতিক বৈধতা পেয়ে যেত কারণ সরকারি তরফ থেকে কোন প্রকার বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া কেউ কোন হত্যার বদলা নিতে পারে না।

কিন্তু দেশের সর্ব্বোচ্চ নের্তৃত্বের সময়োপযোগী দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মত কোন ভুল করেনি। ফলে প্রায় অর্ধশত সেনা অফিসারের প্রাণের বিনিময়ে সমুন্নত হয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর নৈতিক অবস্থান। দেশ বেঁচে যায় এক অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধ থেকে।

সময়ের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে Code of Conduct ভঙ্গ করার ফলাফল সবসময়ই যে ইতিবাচক হয়েছে তা বলা যাবে না। যেমন, ১৯৯৬ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে যখন আন্দোলন চলছিল, তখন তৎকালীন সচিব ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং মি. সফিউর রহমানের নের্তৃত্বে একদল সরকারি অফিসার Code of Conduct ভঙ্গ করে 'জনতার মঞ্চে' আরোহন করেন এবং প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী অবস্থান নেন। তাদের এই বিদ্রোহে তৎকালীন বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে নতুন তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ।

সরকারি অফিসাররা তাদের নিয়ম ভঙ্গ করার পুরস্কার তৎক্ষণাতই পেয়েছিলেন। ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর হয়েছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং মি. সফিউর রহমান হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনার।

তাদের এই Code of Conduct ভঙ্গ করার সুফল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার হাতে নাতে পেলেও এই নিয়ম ভঙ্গের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ইতিবাচক হয়নি। কারণ এই ঘটনাটির জন্যই প্রশাসনে দলীয়করণ বর্তমানে রীতিমতো একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, যে কোন Code of Conduct বা Code of Ethics এর মধ্যে পরিবর্তন আনার অধিকার রয়েছে তাদেরই যারা এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন, বাংলাদেশ সরকারি অফিসারদের জন্য যে নৈতিকতার মানদন্ড রয়েছে, তাতে পরিবর্তন আনার এখতিয়ার একমাএ বাংলাদেশ সরকারের, অন্য কারোর নয়। এই মানদন্ডে হাত দেয়ার এখতিয়ার কোন ব্যক্তিবিশেষের নেই। একমাএ সরকার প্রধান কিংবা তার মন্ত্রী পরিষদই পারেন এই নৈতিকতার মানদন্ডে পরিবর্তন আনতে। একইভাবে বলা যায়, আল্লাহ যুগে যুগে ধর্মগ্রন্থগুলির মাধ্যমে যে নৈতিকতার মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। এই এখতিয়ার একমাএ আল্লাহর।

উপরের বিস্তারিত আলোচনার আলোকে আমরা যদি এখন কালো টাকা সাদা করার পদক্ষেপটি পর্যালোচনা করি, তাহলে প্রথমেই দেখতে পাব, ধর্মগ্রন্থগুলির কোনটিতেই আসলে কালো টাকাকে সাদা করা অনৈতিক বা পাপ বলে উল্লেখ করা হয়নি। আমার

জানামতে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে কোন আলোচনাই কোন ধর্মগ্রন্থে করা হয়নি। কারণ ধর্মগ্রন্থগুলি যখন নাজিল হয়েছিল তখন কালো টাকা এবং সাদা টাকার কোন প্রকার ধারণা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল না।

তাই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আল্লাহপাক মানুষের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এই আইন বৈধ, নাকি অবৈধ, নৈতিক, নাকি অনৈতিক, তা দেখতে হলে আমাদেরকে এর পরে তাকাতে হবে মানব সৃষ্ট আইনগুলোর দিকে।

মানবসৃষ্ট আইনেও যদি আমরা তাকাই তাহলেও দেখব, অন্যান্য দেশেও যেমন একই রকম সুযোগ এর আগে দেয়া হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশেও হয়েছে। তাই এই কাজটিকে বৈধ বা নৈতিক করেছে সরকারই যার পুরো অধিকার সরকারের রয়েছে। বরং এই কাজটি যে অনৈতিক তার কোন প্রকার দালিলিক প্রমাণ নেই।

তাহলে প্রশ্ন হল শুধু শুধু এই কাজটিকে অনৈতিক বলা হচ্ছে কেন?

এই কাজটিকে অনৈতিক বলার একটি যুক্তি হল যারা আয় করে কোন প্রকার হিসাব সরকারের কাছে দেন না তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এই আয়টি করছেন মাদক চোরাচালান করে, সন্ত্রাস করে, কিংবা হুন্ডি ব্যবসা করে। তাই যদি কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে এই সকল ব্যক্তিরা সমাজে বৈধতা পাবে। তাই এদেরকে বৈধতা দেয়া অনৈতিক।

হ্যা। এই ধরণের যুক্তি ঠিক আছে। কিন্তু কালো টাকা সাদা করতে দেয়ার মানে তো এই নয় যে চোরাচালানকারী, সন্ত্রাসী কিংবা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা বিচারাধীন, সেই সকল মামলা তুলে নেয়া হবে, কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই সকল অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাদের নিয়মিত অভিযান থামিয়ে দেবে। এই ধরণের কোন দাবী তো করা হচ্ছে না।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার ফলে এই সকল অবৈধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা এখনো ধরা পড়েননি, তারা নীরবে বৈধতা পেয়ে যাবেন, এটাও ঠিক। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যারা অবৈধ ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা আয় করছেন, এবং এখনো ধরা পড়েননি, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সমাজে একটি বৈধ পরিচিতি রয়েছে। তারা এই অবৈধ ব্যবসাগুলি করছেন মুলত সেই বৈধ ব্যবসার আড়ালে। তাই তাদেরকে যদি এখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি এই টাকা কোথায় পেয়েছেন, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেবেন, এই টাকা তারা আয় করেছেন তাদের বৈধ ব্যবসার মাধ্যমেই।

এখানে সরকারের মূল কাজ হল অবৈধ কাজ করার সময়ই এই সকল ব্যক্তিদেরকে হাতেনাতে ধরা। সরকার যেহেতু সেই কাজটি করতে পারেনি, সেহেতু তাদেরকে ধরারও কোন প্রকার রাস্তা এখন আর খোলা নেই।

তাই কালো টাকা সাদা করা অনৈতিক, এই অবস্থানটি সঠিক নয়।

আমার এই মন্তব্যে একদল ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে চিৎকার করে বলতে পারেন, "You shut up। ধর্মগ্রন্থভিত্তিক নৈতিকতার এই মানদন্ড আমরা মানি না। We don't accept this religion based code of ethics। এইগুলো ফালতু। বরং আমরাই ঠিক করব কোনটি নৈতিক, এবং কোনটি অনৈতিক। এর জন্য কোন ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনার পরোয়া আমরা করব না। We have this authority to decide what ethics means।"

এই ধরণের বক্তব্য যদি সত্যি সত্যি দেয়া হয় তাহলে আমার আসলে বলার কিছুই থাকবে না। তবে আমার মতে, এই সকল ব্যক্তিদের নৈতিকতা আসলে "হাওয়াই নৈতিকতা"। 'হাওয়া' অনুকূলে থাকলে একটি কাজ তাদের কাছে নৈতিক মনে হয়, আবার 'হাওয়া' পাল্টালেই তাদের কাছে সেই কাজটিকেই আবার অনৈতিক মনে হয়। তাই যাদের কলমের খোঁচায় কিংবা বক্তব্য বিবৃতিতে এই ধরণের নৈতিকতার বার বার হাওয়াই পরিবর্তন ঘটে, তাদের কথায় খুব একটা কান দেয়ার আসলে কোন যুক্তি নেই।

২. <u>এই ব্যবস্থায় সৎ কর দাতারা নিরুৎসাহিত হবে</u>

হ্যা। এটা হতে পারে। তাই কালো টাকা সাদা করার কর হার এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে সৎ করদাতারা বৈষম্যের শিকার না হন। উপরের প্রস্তাবনায় নগদ অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার জন্য উচ্চ কর হার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে এই বৈষম্যটি আর থাকবে না।

এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার কর হার তো অনেক কম প্রস্তাব করা হয়েছে। তাহলে বৈষম্য তো রয়েই গেল।

না। তাতেও কোন বৈষম্য থাকবে না। কারণ বিনিয়োগের সাথে ঝুকিও রয়েছে। একটি সৎ প্রতিষ্ঠান যদি ঠিক মতো কর দিয়ে তার লাভ একটি সঞ্চয়ী হিসাবে রেখে দেয়, তাহলে সেই একাউন্ট থেকে কোম্পানিটি প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বা লাভ পাবে। দুর্নীতি দমন অভিযানের কারণে কোম্পানিটিকে কোন প্রকার ভীতির মধ্যে থাকতে হবে না।

কিন্তু অন্যদিকে কোন অসৎ প্রতিষ্ঠান যদি একইভাবে অপ্রদর্শিত আয় সঞ্চয়ী হিসাবে রেখে মুনাফা বা সুদ পেতে থাকে, তাহলে তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই পেতে উপরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই টাকা অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে। তাই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রথম প্রতিষ্ঠানের মত অনেকটা ঝুকিহীন ভাবে মুনাফা বা সুদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রতিটি বিনিয়োগেই ঝুকি রয়েছে। বিনিয়োগকারী যখন বিনিয়োগ করেন, তখন এই ঝুকিগুলো বিবেচনায় নিয়েই তিনি বিনিয়োগটি করেন। তিনি আগেভাগেই ধরে নেন তার এই বিনিয়োগ করা টাকা মুনাফা সহ ফেরত আসতে পারে কিংবা বিনিয়োগটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই উপরের উদাহরণ থেকে আশা করি সকলেই একমত হবেন যে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে যদি কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে সৎ করদাতারা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার হবেন না।

তবে কোন শিল্পমালিক যদি নতুন শিল্প না গড়ে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানেই তার কালো টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, সেই শিল্পমালিক বছর বছর কর না দিয়ে সঞ্চিত টাকা আবারো একই প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলেন। ফলে তিনি প্রকৃত কর দিলেন অনেক কম।

এই ধরণের প্রবণতা যাতে না হয় তার জন্য অডিটরদেরকেই সঠিকভাবে অডিট করতে হবে। ব্যবসার আয় বিবরণী এবং ব্যালেন্স শীটে ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা, যে পরিমাণ কর দেখানো হচ্ছে, তা প্রকৃত কর কিনা, তা দেখার দায়িত্ব অডিটরদেরই। অতএব, অডিটরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

সেইসাথে ব্যাংকের এলসি খুলতে গেলে এবং ব্যবসা করার অন্যান্য ধাপেও যদি ট্যাক্স রিটার্ন দেখানো বাধ্যতামুলক করা হয়, তাহলে অসৎ ব্যবসায়ীদের এই ধরণের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব।

৩. **ব্যাংক থেকে সঞ্চয় তুলে নেয়ার ফলে ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। তাছাড়া এই কালো টাকা যেহেতু ইতিমধ্যেই পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে সেহেতু এতে কোন নতুন বিনিয়োগ হবে না। তাই কালো টাকা সাদা করার মাধ্যমে বিনিয়োগের স্থানান্তর ঘটবে মাএ।**

এই ধরণের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরণের কোন পরিস্থিতির আশঙ্কা নেই কারণ যে সঞ্চয় ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে বিনিয়োগ করা হবে তা আবার অন্য হাত ঘুরে ব্যাংকের কাছেই ফেরত আসবে। কিন্তু এরই মাঝে সৃষ্টি হবে নতুন শিল্প, নতুন কর্মসংস্থান। সেই সাথে সৃষ্টি হবে নুতন ঋণের সুযোগ। সেই অতিরিক্ত ঋণের চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাংকগুলো নিম্নোক্ত দুটি পন্থা অবলম্বন করবেঃ

(১) ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার করে ঋণের চাহিদা মেটাবে, এবং
(২) সঞ্চয়ের সুদের হার বাড়িয়ে নতুন সঞ্চয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে।

প্রথম পন্থাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে নতুন ঋণের চাহিদা মেটাবে। ফলে বাড়বে টাকার সরবরাহ, কিন্তু যেহেতু এই অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ তৈরী হয়েছে অধিক বিনিয়োগের চাহিদার কারণে, সেহেতু এই অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ অর্থনীতিতে কোন প্রকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে না। তবে ব্যাংকগুলিকে অতিরিক্ত ঋণের চাহিদা মেটানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন অতিরিক্ত লাভ করতে গিয়ে আবার খারাপ শিল্পগুলিকে ঋণ না দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও নজরদারি বাড়াতে হবে।

যে কালো টাকা ইতিমধ্যেই সরাসরি বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে (যেমন গাড়ি, বাড়ি, ইত্যাদি), সেই সম্পদকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিপরীতে বৈধ করলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। তবে এটা ঠিক যে এতে কোন নতুন বিনিয়োগ হবে না। এখানে মূলত বলা হচ্ছে সেই সকল অপ্রদর্শিত আয়ের কথা যা এখনো সরাসরি বিনিয়োগ করা হয়নি।

আবার দ্বিতীয় পন্থাতে হারিয়ে যাওয়া সঞ্চয় পূরণ করার জন্য ব্যাংকগুলো বাধ্য হবে তাদের সঞ্চয়ের সুদের হার বাড়ানোর প্রতি। কিন্তু অপরদিকে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করার কারণে ব্যাংকগুলো ঋণের সুদের হার কমাতে বাধ্য হবে। ফলে এর প্রতিক্রিয়ায় ব্যাংকের স্প্রেড কমে আসবে যা কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দীর্ঘদিন থেকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছে।

এই পুরো প্রক্রিয়াতে মানুষের অপ্রদর্শিত সঞ্চয়কে ব্যাংকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিনিয়োগে উৎসাহিত না করে বরং সরাসরি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে পরোক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে সরাসরি বিনিয়োগ যে অর্থনীতির জন্য লাভজনক তার সবচেয়ে প্রমাণ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্টক এক্সচেঞ্জগুলো। এই স্টক এক্সচেঞ্জগুলো তৈরীই হয়েছে মানুষকে ব্যাংকে টাকা না রেখে সরাসরি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য।

এখানে যে প্রস্তাবগুলো করা হচ্ছে যা যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা বাস্তবায়িত হবে ধীর গতিতে, হঠাৎ করে নয়। ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে এর কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আসলে কোন আশঙ্কাই নেই।

এই পদক্ষেপটির প্রভাব

একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান চালু করার পাশাপাশি কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার প্রভাব সুদুরপ্রসারী। এই ধরণের কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রভাব নীচে উল্লেখ করা হলঃ

১. এই অভিযানের কারণে দেশ ধীরে ধীরে দুর্নীতিমুক্ত হবে। ফলে এর প্রভাব পড়বে জাতীয় জীবনে।

২. মানুষ তার অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার ফলে চাহিদা এবং সরাসরি বিনিয়োগ বাড়বে। ফলে উন্নত হবে অর্থনীতি।

৩. মানুষের মনে কর দেয়ার জন্য এক প্রকারের তাগিদের সৃষ্টি হবে। ফলে ধীরে ধীরে আমাদের দেশ স্বাবলম্বী হবে।

৪. উপরের প্রস্তাবনাতে দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে দেশে বিশ্বায়নের প্রভাবে যে সকল ঝুকি রয়েছে, তা অনেকাংশেই কমে আসবে।

৫. যে কোন প্রকার মন্দা মোকাবেলার উপায় হল চাহিদা এবং বিনিয়োগ সৃষ্টি। উপরের প্রস্তাবনাতে চাহিদা এবং বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেশে অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার একটি উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে[১৫]। তাই মন্দাতে খুব বেশি কষ্ট পেলে এই পন্থাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এখানে বলা দরকার, উপরের প্রস্তাবনাগুলি সাজানো হয়েছে বাংলাদেশের বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে। তাই অন্যান্য দেশ যদি এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে তা করতে হবে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখেই।

[১৫] তত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে বিনিয়োগ স্থবিরতার মুল কারণ ছিল দুর্নীতি দমন অভিযানের কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক। কিন্তু বর্তমানের বিনিয়োগ স্থবিরতার মুল কারণ অন্যান্য দেশে মন্দার কারণে চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কায় নতুন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবসায়ীদের ধীরে চলো নীতি। তাই বাংলাদেশের বর্তমান বিনিয়োগ স্থবিরতা কাটাতে বহির্বিশ্বের চাহিদা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে।

নেতিবাচক প্রচারণার ক্ষতিকর প্রভাব

কালো টাকা সাদা করা নিয়ে অতীতে এবং সাম্প্রতিককালে অনেক নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়েছে। অনেক সময় এমনও দাবী করা হয়েছে যারা অতীতে কালো টাকা সাদা করেছেন, তাদের নাম যেন প্রকাশ করা হয়। যে সকল ব্যক্তি সময় সময় কালো টাকা সাদা করার পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন, তারাই আবার হাওয়া পাল্টানোতে তাদের বক্তব্য সময় সময় পরিবর্তন করেছেন।

কোন কিছু না বুঝে এই ধরণের নেতিবাচক প্রচারণা দেশের জন্য যে কতটুকু ক্ষতিকর, তা আমি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করছি।

সরকার যদি এই ধরণের প্রচারণাকারীদের খুশি করতে গিয়ে এবং প্রচারণার প্রভাবে সৃষ্ট ভুল জনমতকে মুল্য দিতে গিয়ে ভবিষ্যতে কখনো ভুল করেও কারো নাম প্রকাশ করে ফেলে এবং তাকে সমাজে হেয় করে কিংবা শাস্তি দিয়ে দেয়, তাহলে এই পন্থার সকল অর্থনৈতিক গুরুত্বই হারিয়ে যাবে। কারণ তখন সরকারের কথাকে আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

ফলে সরকার যদি ভবিষ্যতে একটি ব্যাপক দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনা করে, তাহলে যাদের কালো টাকা রয়েছে, তারা সেই টাকা সুযোগ দেয়া সত্বেও বৈধ করবেন না। বরং তখন তাদের এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অবৈধ এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হবে যারা মানুষের কালো টাকাকে সহজে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার সেবা চালু করে টাকা পাচার করবে।

ফলে সরকার যখন এই ধরণের একটি প্রবণতার মুখোমুখি হবে, তখন সরকার বাধ্য হয়েই দুর্নীতি দমন অভিযান থামিয়ে দেবে যেমন থামিয়ে দিয়েছিল বিগত তত্বাবধায়ক সরকার। এই ধরণের একটি অবস্থা যদি আবারো সৃষ্টি হয়, তাহলে সমাজ থেকে আর কোনদিন দুর্নীতি দমন হবে না।

তাই আমরা দুর্নীতির সাথে আজীবন সহাবস্থান করে যেতে থাকব। ফলে এমন এক দিন আসবে যখন দুর্নীতির সর্বব্যাপী থাবা আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারকেও গ্রাস করবে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। সেই দিন আর ভুল স্বীকার করেও কোন লাভ হবে না।

তাই সব কিছু বোঝার পরও কালো টাকা সাদা করার বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রচারণা চালানোর আগে এই ধরণের প্রচারণা যে দেশ, সমাজ এবং নাগরিকদের জন্য যে কতটুকু ক্ষতিকর, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। এবং সেইসাথে সরকারেরও উচিত কোন প্রকার নেতিবাচক প্রচারণাকে গুরুত্ব না দিয়ে জনমনে নিজেদের আস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

তত্ত্বের দুর্বলতা

একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই – এই তত্ত্বটির একটি দুর্বলতা রয়েছে। এই তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছে যে সরকার এমন কোন প্রস্তাব দেবে না যাতে কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে উল্টো পুরস্কৃত হবেন।

সরকার যদি কালো টাকার মালিকদেরকে জরিমানার মাধ্যমে তিরস্কৃত না করে উল্টো পুরস্কৃত করার কোন প্রস্তাব দেয়, তাহলে কোন প্রকার দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে। যেমন সরকার যদি ঘোষণা দেয় যারা ১০% করের বিনিময়ে কালো টাকা সাদা করবে, তাদেরকে পরবর্তীতে ডেকে ডেকে মন্ত্রী বানানো হবে, কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারি খরচে তাদের মূর্তি বসানো হবে, অথবা তাদেরকে সিআইপি স্ট্যাটাস দিয়ে বছর বছর পুরস্কৃত করা হবে, তাহলে কোন প্রকার ভীতি ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে। এর জন্য কোন কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রয়োজন নেই।

এই ধরণের একটি পরিস্থিতি হাস্যকর হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা মোটেই হাস্যকর নয়। বরং সাম্প্রতিককালে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যাতে কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে বরং পুরস্কৃত হবেন।

যেমন, এফবিসিসিআই'এর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল সরকার যেন কালো টাকা সাদা করার জন্য বন্ড ছাড়ার ঘোষণা দেয়। বন্ড সঞ্চয়পত্রেরই আরেক নাম যাতে বছর বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়া হয়। তাই কালো টাকার মালিকরা যদি ১০% জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করে সেই টাকার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে আবার বছর বছর ৮% হারে ঝুকিমুক্ত সুদ পেতে থাকেন, তাহলে সেই ১০% জরিমানার তো কোন অর্থ হল না। কারণ এই ক্ষেত্রে কার্যকর জরিমানা বা Effective Penalty হবে মাত্র ২%।

একইভাবে সরকার পুঁজিবাজারে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দিয়েছে, তাতেও কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে প্রকারান্তরে পুরস্কৃত হতে পারেন। পুঁজিবাজারে যে সকল প্রতিষ্ঠান

ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত হয়ে গেছে, সেই সকল কোম্পানির শেয়ার কিনলে নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কোন নতুন কর্মসংস্থানও হয় না। তাই এই খাতে কালো টাকা সাদা করতে দিলে পুঁজিবাজারে অহেতুক টাকার সরবরাহ বাড়বে। ফলে কৃত্রিমভাবে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হবে। ফলে একটা সময় আসবে যখন এই কৃত্রিম শেয়ার বাজারে ধ্বস নামবে।

পুঁজিবাজারে কালো টাকার প্রবাহ একটি নিয়মিত ব্যাপার এবং সরকারের নজরদারীর অভাবে প্রতিনিয়তই শেয়ার বাজারে কালো টাকার প্রবেশ ঘটছে। তবে শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে টাকার প্রবাহ বাড়িয়ে শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করলে তাতে লাভ হবে শুধু সেই সকল বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের যারা শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তাই সত্যি সত্যি যদি শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে হয়, তাহলে শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা বাড়িয়েই তা করতে হবে। ভাল কোম্পানি শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত হলে নতুন বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবেন এই বিনিয়োগে। ফলে তারা তাদের জমানো টাকা এই নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আইপিওতে বিনিয়োগ করবেন। ফলে বাড়বে শেয়ার বাজারের তারল্য, ব্যাপ্তি এবং টাকার প্রবাহ। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে কিংবা আইপিওতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার যে প্রস্তাবটি এই পেপারে করা হয়েছে, তাতে শেয়ার বাজার প্রকৃতভাবে চাঙ্গা করারই উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, করফাঁকির অপরাধকে কোন অবস্থাতেই একটি লঘু অপরাধ হিসাবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই। ঘুষের লেনদেন, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই এর মতো করফাঁকিও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে একটি জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। সাম্প্রতিককালে মাএ কয়েক লক্ষ টাকার করফাঁকির কারণে অনেক রাজনীতিবিদকে ১৩ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। অথচ একই অপরাধে বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে পুঁজিবাজারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে।

করফাঁকি একটি দন্ডনীয় অপরাধ হলেও এই পেপারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে একমাএ বাংলাদেশের বাস্তবতার কারণে। বাংলাদেশে ঘুষের লেনদেন যেমন একটি বাস্তবতা, তেমনি করফাঁকিও একটি বাস্তবতা।

বাংলাদেশের করফাঁকির বাস্তবতাকে কমবেশি সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন বটে, তবে তা মানতে গিয়ে সম্মানিত করফাঁকিবাজদের আয়কে কোন প্রমাণ ছাড়াই বৈধ পথে উপার্জিত বলে দাবী করে এই অপরাধকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, এই

ধরণের প্রচেষ্টা করফাঁকির অপরাধকে একটি লঘু অপরাধ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফলে ভবিষ্যতে কোন মানুষ আর কর দিতে উৎসাহ বোধ করবে না এবং বাংলাদেশও কোনদিন স্বাবলম্বী হতে পারবে না।

এখানে পাঠকরা লক্ষ্য করুন, এই পেপারটির কোথাও ঘুষের লেনদেনকে মহিমান্বিত করার কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। বরং সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে দুর্নীতি বাংলাদেশের যে একটি বাস্তবতা, সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বাস্তবতা যদি আমরা স্বীকার করে নেই, তাহলে এই সমস্যাটি সমাধানে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

আমরা মনে করি, ঘুষের লেনদেন এবং করফাঁকির ব্যাপারে আমাদের সবাইকে বাল্যশিক্ষার সেই লেসনেই ফিরে যেতে হবে যেখানে বলা হয়েছে 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'। তাই আমরা যদি এই দুটি বিষয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পাপের সাথে সাথে পাপীকেও ঘৃণা করা শুরু করি কিংবা পাপকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা শুরু করে দেই, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করব।

আমাদের এটাও বলতে দ্বিধা নেই, আমরা মনে করি করফাঁকিও ঘুষের লেনদেনের মত একটি দুর্নীতি, কারণ এটি আইনের ফাঁকফোকর এবং সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে করদাতার ক্ষমতার অপব্যবহার। কিন্তু এই মতের সাথে অধিকাংশ নাগরিকই আশা করি অমত করবেন। কারণ করফাঁকিকে দুর্নীতি বললে কম বেশি সকলেই যে দুর্নীতিবাজ হয়ে যান। আর 'দুর্নীতিবাজ' গালিটি কে শুনতে চায় বলুন?

[পুনশ্চঃ দুর্নীতি ধরার যে দুটি কৌশলের কথা এই পেপারে বলা হয়েছে, এর বাইরে তৃতীয় কোন কৌশল অবলম্বন করে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করার কোন উপায় আছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তাই কালো টাকা সাদা না করেও কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূলের একটি তৃতীয় অথচ অধিকতর কার্যকরী উপায় বাতলে দিতে পারেন, তাহলে আমরা কালো টাকা সাদা করার পরামর্শ আর দেব না। এই ধরণের নতুন আইডিয়া যদি কেউ উদ্ভাবন করতে পারেন, এবং আমাদেরকে সাথে সাথে জানান, তাহলে আইএফডি এই নতুন আইডিয়াটি নিয়ে আরেকটি পেপার প্রকাশ করতে প্রস্তুত রয়েছে।]

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। দুটি পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মেধা তালিকাতে স্থান ছিল যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম। পাশ করার সাথে সাথেই গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান আমেরিকাতে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই পত্রিকায় লেখালেখি শুরু। দেশের একাধিক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. ম. মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, ইন্টারনেটে বাংলা সংবাদপত্র পড়েন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মুল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. ম. মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মুল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মুলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরী করছে এবং তার সফল বাস্ত বায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরী করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাএ। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরী করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মুল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বএই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মূল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরী এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাত্র আইডিয়া তৈরী এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরী এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন

সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তি পুর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমুলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©Ideas for Development
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org